
প্রতিদিন
১০ নভেম্বর ২০১৩
রোববার
সন্দেশ
সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে
সন্দেশ
৮ উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ,স্ক্যান ও এডিট ঃ বুক ম্যান

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


অঞ্জলি
জুয়েলার্স
সবার জন্য
কস্টিউম
কালেকশন
উপহার কেনা
আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়।
সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন
স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
জুয়েলপ্লাস স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০,
১০০০ টাকা বা তার বেশীর
কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাসের কিস্তি দিন
১ মাসের কিস্তি পান
ডিসকাউন্ট!
এবার আপনি জুয়েলপ্লাস স্কীম
করতে পারেন ১৮ বা ২৪ মাসের জন্যেও!!
ECS-এর সুবিধাও আছে।
নতুন শোরুম
গড়িয়া - ১০০ বি, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা ৪৭, ফোন : (০৩৩) ২৪৩০ ০৪৩৮
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২
শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২৭৮৬
সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - (০৩৫৩) ২৬৪৩৩৩৫
বৌবাজার - ২২৬৪ ১১৯৫
বহরমপুর - (০৩৪৮২) ২৫৮ ৪৯৮
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
এখন গয়না কিনুন অনলাইনে, শুধুমাত্র www.anjalijewellers.in - এ
Mayurakshi/1001/13

প্রতিদিন

১০ নভেম্বর ২০১৩

রোববার

সৌজন্য : প্রণবেশ মাইতি, সন্দীপ রায়, সৌম্যেন পাল ও সত্যজিৎ রায় সোসাইটি

এই সংখ্যায় নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর 'কথা অমৃত সমান', ভাস্কর লেট-এর 'অক্ষরবৃত্ত', গৌতমকুমার দে-র 'ডাকসাইটে' এবং দেবদত্ত গুপ্ত-র 'এককলি' প্রকাশিত হল না।

রোববার-এর নতুন ওয়েব-ঠিকানা
রোববার
www.ezinemart.com

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী, বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সুপ্রিয় দাস
সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

অকিঞ্চিৎ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার দিনগুলোতে জুজুবাবুর মন একটু খারাপ থাকে। ওইদিন জোরসে ‘প্যাঁক’ হয় কিনা! ওই জন্য ডাক্তারের নাম শুনলেই মাঝে-মাঝে সে বলে ‘ডাকালা, ডাকালা।’ শুধু শুনলেই হবে না। বুঝতেও হবে। মানে, ডাক্তার না, ডাক্তার না।



‘সন্দেশ’-এর প্রচ্ছদ। অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

‘বাব্বা’ আর ‘মাম্মা’ ছাড়া জুজু-র প্রথম বলতে শেখা শব্দ ‘উ’। দেওয়ালে টিকটিকি দেখলে উত্তেজিত হয়ে ‘উ’ বলে উঠত। ওর দেখাদেখি আমরাও টিকটিকিকে ওই স্বরবর্ণ দিয়েই ডাকতে শিখি। তখন দাদুকে ডাকত ‘কাগা’ বলে। আসলে বাবা ওকে দেখলেই ‘ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া’ গাইত। ‘কাকাতুয়া’ থেকে ‘কাগা’। আমরা অবশ্য বাবার ক্ষেত্রে টিকটিকির পন্থা নিইনি, ‘বাবা’ বলেই ডাকতাম। আরও একটু কথা ফুটলে জুজু পড়ল মধুজা-র আই প্যাড নিয়ে। নড়েচড়ে, আওয়াজ করে, গান গায়—বিস্ময়ে ওর চোখের পাতা অবদি সরত না। তার নাম হল ‘অন্য’। যা সারা পৃথিবীর বাজারে এতটাই মেনস্ট্রিম, আপেলখেকো সূত্র শিকেয় তুলে তাকে অল্টারনেটিভ বানানো কী কম কথা! ‘আই প্যাড’ এখন আমাদের কাছেও ‘অন্য’। দিনে চারশোবার একই ফোনিক সং শুনতে-শুনতে জুজু গোরিলা চিনল। মস্ত ফেভারিট বন্ধু তার। তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো জুজাই? বাব্বা না মাম্মা? একগাল হেসে সে বলে, ‘গোলালা’।

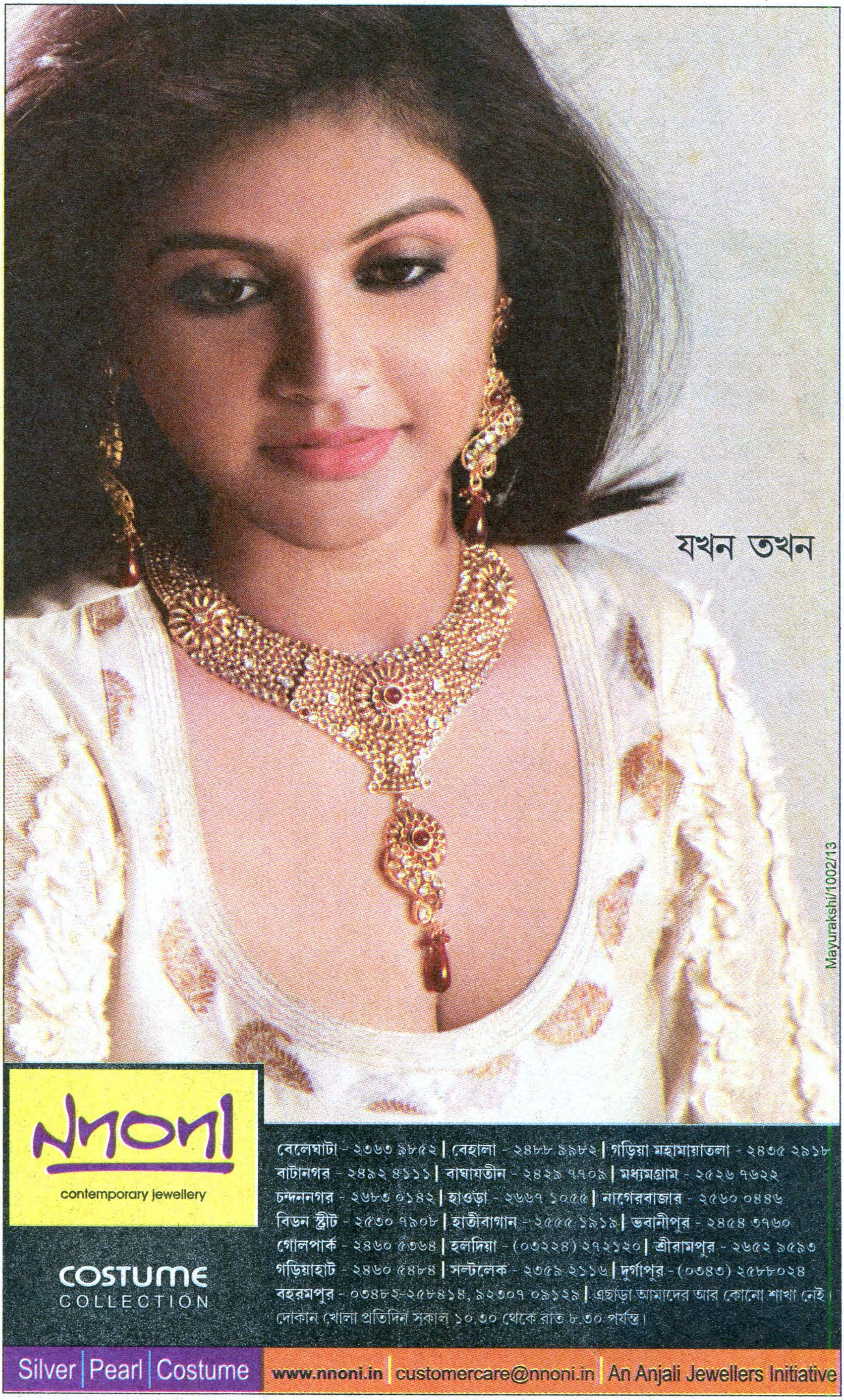
তারপর থেকে তার ধ্যান-জ্ঞান শুধুই গোলালা। জুজুবাবুর গোলালা-গোলায় পাগল হয়ে একটা ল্যাজওলা সফ্‌ট টয় কিনে দেওয়া হল তাকে। এর মধ্যে ‘ফাইন্ডিং নিমো’-র ক্লিপিং ‘অন্য’-তে দেখেছেন তিনি। ফলে আম্মার অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছ থেকে গড়িয়াহাট বাজারের কাটাপোনা—সবই হল ‘নিমো’। আমাদের বাড়ির টিভি খারাপ। আপার বাড়িতে রিমোট নিয়ে যত মাস্তানি জুজুয়ার। রিমোটের নাম দাঁড়াল ‘ওম্’। তত দিনে জুজুবাবুর দুই বডিগার্ড নমিতা ‘পুনু’ এবং সোমা ‘তাম্মা’ হয়ে গিয়েছে।

‘লায়ন কিং’-এ ‘তিম্বা’-র বাবাকে দেখে সে খুবই খুশি—এল্ ফর লালন। প্রসেনজিৎ-এর পর আবার একজন অন্য ‘লালন’। তারপর জুজুবাবু গান গাইতে শিখল একটু-একটু। দাদুর কাছে ‘ময়নার মা ময়নামতী’ শুনতে ‘মানি, মানি’ বলে বায়না পাড়ে। ‘হাট্টি মা টিম টিম’-কে গায় ‘হাটুম’ বলে। একদিন-আধদিন অবশ্য তার একটু মনখারাপ থাকে। যেদিন-যেদিন ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হয়। ওইদিন জোরসে ‘প্যাঁক’ হয় কিনা! তারপর ‘নজেন’ দিলেও, অল্প লাগে। ওই জন্য ডাক্তারের নাম শুনলেই মাঝে-মাঝে সে বলে ‘ডাকালা, ডাকালা।’ শুধু শুনলেই হবে না। বুঝতেও হবে। মানে—ডাক্তার না, ডাক্তার না। তারপর মনখুশি হলেই ‘টিয়া টিয়া টিয়া অজ পাড়া গাঁয় থাকে’-র নোলক পরা নাকে ‘নোলানাকা’ বলে গাইতে থাকে একজন। কারও বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ফিরে আসার পর জিগ্যেস করি তাকে, ব্যবস্থা সব ভাল? গম্ভীর মুখে সে জানায়, ‘কুব্ বালো’। প্রথম জন্মদিনে পাওয়া অনেক ‘গিট্টি’ থাকলেও বাবার গিট্টি বাজানোটাই তার বেশি পছন্দের।

একদিন সকালে উঠে অবাক কাণ্ড, দেখি, জুজা, মানে আহিরনাথ, যার দুই পূর্ণ হল আজই, ‘গোলালা’-কে গোরিলা বলে ডাকছে। একমাস আগেও তার সবচেয়ে ভাল লাগার ‘চাম্মিন’ আর ‘আক্কুম’-কেও বেশ স্পষ্ট করে ‘চাউমিন’ ও ‘আইসক্রিম’-এ পাল্টাতে শিখেছে। ‘সিংহ’, ‘লালন’ পেরিয়ে আপাতত ‘তিঙ্গো’-র মুখোমুখি। বিটল্‌স-এর পোস্টার দেখে নিজে-নিজেই বলছে: ‘বড্ডা মেদ্দা ছেজদা ছোদ্দা’। রাতে ঘুমের আগে এখন মাঝে-মধ্যে ইয়ার্কি করে আমাদের বাব্বাদাদা, মাম্মাদিদি বলেও ডাকে। ‘মাম্মাকে ভালবাসি’ আর ‘বাব্বাকে বাসি না’—এসবও বলছে। আপার বাড়ি গিয়ে দরজা ঠুকে জানান দিচ্ছে, চট্টোপাধ্যায় এসেছে।

এত তাড়াতাড়ি এভাবে বড় হয়ে যেতে হয়, জুজাই? ওই যে ঘরজুড়ে ছড়ানো গোলালা, ওম্, চাম্মিন, আক্কুম, লালন, হাটুম, নিমো, উ, ডাকালা—এখন এগুলো নিয়ে কী করব তা হলে আমরা?

পুনশ্চ: সন্দেশকে ‘সন্দেশ’ নামেই যাঁরা চেনেন, তাঁদের জন্য রইল শুভ বিজয়ার অসামান্য মিষ্টিমুখ।


যখন তখন
Mayurakshi/1002/13
nnoni
contemporary jewellery
COSTUME
COLLECTION
বেলেঘাটা - ২৩৬৩ ৯৮৫২ | বেহালা - ২৪৮৮ ৯৯৮২ | গড়িয়া মহামায়াতলা - ২৪৩৫ ২৯১৮
বাটানগর - ২৪৯২ ৪১১১ | বাঘাযতীন - ২৪২৯ ৭৭০৯ | মধ্যমগ্রাম - ২৫২৬ ৭৬২২
চন্দননগর - ২৬৮৩ ০১৪২ | হাওড়া - ২৬৬৭ ১০৫৫ | নাগেরবাজার - ২৫৬০ ০৪৪৬
বিডন স্ট্রীট - ২৫৩০ ৭৯০৮ | হাতীবাগান - ২৫৫৫ ১৯১৯ | ভবানীপুর - ২৪৫৪ ৩৭৬০
গোলপার্ক - ২৪৬০ ৫৩৬৪ | হলদিয়া - (০৩২২৪) ২৭২১২০ | শ্রীরামপুর - ২৬৫২ ৯৫৯৩
গড়িয়াহাট - ২৪৬০ ৫৪৮৪ | সল্টলেক - ২৩৫৯ ২১১৬ | দুর্গাপুর - (০৩৪৩) ২৫৮৮০২৪
বহরমপুর - ০৩৪৮২-২৫৮৪১৪, ৯২৩০৭ ০৯১২৯ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত।
Silver | Pearl | Costume
www.nnoni.in | customercare@nnoni.in | An Anjali Jewellers Initiative

পবিত্র সরকার

আবার ঘঞ্চু

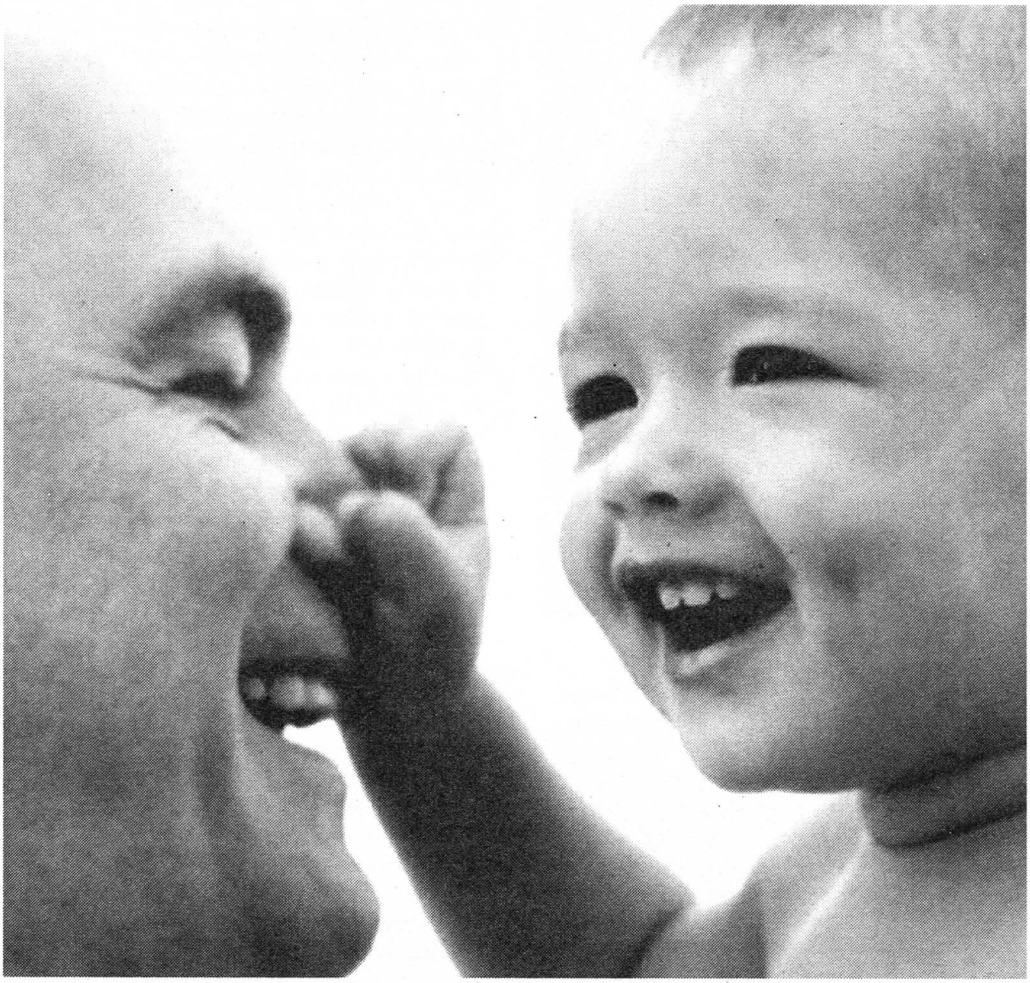


ঘঞ্চু 'ফুলে ফুলে' গানের 'তটিনী হিল্লোল তুলে'-তে পৌঁছেই আমার চালাকি ধরে ফ্যালে। সে বুঝতে পারে যে, এই টাক মাথা বুড়োটা তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে বিশ্বপর্যটনের জন্য লোকটার কাঁধে চড়ে বসেছে, আর সে লোক কিনা চেয়ারে শুয়ে দোল খেতে খেতে মনের সুখে হেঁড়ে গলা ছাড়ছে!

পুজোর সময় ঘঞ্চু তার মায়ের সঙ্গে আবার আমাদের গড়িয়ায় বেড়াতে এসেছিল, তিন-চারদিন ছিল। দেখলাম সে আগের চেয়ে অনেক ভদ্র হয়েছে, না চাইতেই লোকজনকে রাজনৈতিক নেতাদের মতো হাসি বিতরণ করছে। আগে এমন করে নিজের নাক, কান আর মাথার চুল ধরে টানত যে, মনে হত এর পরেরবার যখন দেখব, তখন তার নাক-কানগুলো আর থাকবে না, আর মাথাতেও টাক ফেলে দেবে চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে। যাই হোক, এখন দেখলাম নিজের ওপর সেই হিংস্র আক্রমণের প্রকোপ কমেছে, ফলে তার নাক-কান ঠিক জায়গাতেই আছে, মাথাতেও ছেঁড়া চুলের জায়গায় নতুন চুল গজিয়েছে। ভাগ্যিস গজিয়েছে, নইলে টাক মাথা, খুঁতো মুখ-চোখের পাঁচ মাসের শিশুকে বাড়ির বাইরে বার করা মুশকিল হত। এজন্য আমি আমার বেয়াই-বেয়ানকে কৃতজ্ঞতা জানাব—কারণ তাঁদের সংসর্গেই ঘঞ্চু আগের তুলনায় এমন সভ্যভব্য হয়ে উঠেছে। চুঁচুড়ার গঙ্গার হাওয়ারও গুণ আছে বলতে হবে।

এখন সে যে কাঁদে না, তা নয়। কিন্তু তার মা তার দু'ধরনের কান্নার মধ্যে দিব্যি তফাত করতে পারে। একটা হল খিদের কান্না, যার কথা আগে বলেছি। আর একটা হল কোলে ওঠার জন্য কান্না, বায়নার কান্না। ওই কান্নার সঙ্গে সে পিঠটা উঁচু করে ধপাস ধপাস করে খাটে আছড়ে ফেলতে থাকে। মনে হয়, তার দাদু-দাদির বিয়ে, সে বিয়ে কালক্রমে ঘঞ্চুর মতো ঘটনাকে সম্ভব করেছে—তারই উপলক্ষে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কেনা খাটটিকে সে ভেঙে ফেলার মতলব করছে। তার শরীর আর ইচ্ছের সমস্ত শক্তি যেন তার পিঠে গিয়ে জমেছে। বাইবেলের স্যামসন চুল দিয়ে সব কিছু ভেঙে ফেলত, ঘঞ্চু হয়তো পিঠ দিয়ে ভাঙার একটা নতুন কায়দা আয়ত্ত করেছে। সেই সঙ্গে তুমুল কান্না। তার মা বলে, 'এটা মোটেই জেনুইন কান্না নয়, কান্নার অভিনয় মাত্র। দ্যাখো ওর চোখে বিন্দুমাত্র জল নেই।' সত্যিই তো, চোখে তো সত্যি জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ঘঞ্চুর! অথচ সে হাত-পা আর পিঠ ছুড়ে দাপাদাপি করে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভাবি, চোখে জল নেই তো কী হয়েছে, বয়স কম বলেই থিয়েটারের মতো গ্লিসারিন ব্যবহারে সে পারঙ্গম হয়ে ওঠেনি আর দেখুন দিকি তার কীরকম পাষাণী মা! কোথায় ছেলে কাঁদছে বলে বাড়ি মাথায় করবে, দৌড়ে এসে তাকে আদরে আদরে অস্থির করে দেবে, তা নয়, সে নিজে ওই কান্নাটাকে পাত্তাই দিতে চাইছে না, আর আমাদেরও বারণ করছে, যেন ওই মায়াকান্নাকে বেশি প্রশ্রয় না দিই।

আমি তো পাষাণ নই, তাই আমি ঘঞ্চুর ওই বিক্ষোভ প্রদর্শন বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না, তাকে কোলে তুলে নিই, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না থেমে যায়। তখন তার হাতটা সামনে-পিছনে মেশিনের মতো চলতে থাকে, যেন বারবার করে আমার পিঠ চাপড়ে দেয় সে, বলতে থাকে—'কাজটা বেশ ভালই করলে, আমাকে কোলে তুলে নিয়ে। তুমি বেশ ভাল লোক।' আমার মেয়ে অবশ্য বলে যে, 'তুমি যে ভাবছ ও তোমাকে বাহবা বা শংসাপত্র দিচ্ছে, তা মোটেই নয়। এটা আসলে ওর 'হ্যাট-হ্যাট' করা। অর্থাৎ কোলে তুলেছ বেশ করেছ, এবার চলো—ও আমার



ঘোড়াদাদুন, বাড়িময় ঘোরো, পথে নামো, হিল্লি চলো, দিল্লি চলো। কোলে তুলবে, অথচ খাটের ওপর বসে বা চেয়ারে বসে বলবে, টেলিভিশন দ্যাখো, প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্যাখো, এই ফোতো রসিকতার মইদ্যে আমি নাই।' এই বলে সে সমানে হাত চালাতে থাকে। তার সঙ্গে তার পা-ও অস্থির হয়ে ওঠে। দুয়েই বেশ জোর হয়েছে আমি লক্ষ করি। তার বাবা স্কাইপে তার ছেলের ছবি দেখে মন্তব্য করেছে—'এ কী, আমার ছেলের পা দু'টো জাপানি সুমো কুস্তিগিরের মতো হল কী করে?' তবেই ভাবুন, আমার পিঠে তার হাত আর পা দুই-ই যদি এসে পড়তে থাকে কোনও যান্ত্রিক হাতুড়ির মতো, আমার কী অবস্থা হয়!

ফলে তাকে কোলে নিয়ে আমাকে উঠতেই হয়। বয়স হয়েছে, তাকে নিয়ে পদচারণার প্রকল্পে আমি একটু ভীত থাকি, তাই আমি প্রথমে ভাবি, কোলে নিয়ে খাটের ওপর বসে থাকা আর ঘুরে বেড়ানোর মাঝামাঝি কোনও পথ আছে কি না। আমাদের বাড়িতে তা আছে বলে আমার মনে হয়। সেটি একটি রকিং চেয়ার। তাতে হেলান দিয়ে শুয়ে আমি কখনও লিখি, কখনও আরাম করি, কখনও আরাম করতে করতে আধো ঘুমে ঢুলি এবং ঘুমের আনুষঙ্গিক নানা শব্দ করতে থাকি। অর্থাৎ বসে বা শুয়ে থেকে গতিশীল হওয়ার একটি উপায় সেটি এবং বাড়ির ভূগোলে আমার বুড়ো বয়সের তীব্র আকর্ষণের একটি কেন্দ্র। আমার স্ত্রী বলেন অস্বাস্থ্যকর আকর্ষণ।

সে যাই হোক, আমি ঘঞ্চুকে কাঁধে নিয়ে প্রথমে সেই হেলদোলের চেয়ারে এসে আধশোয়া হই এবং দুলতে থাকি। এই অবস্থায় তার বিনোদনের জন্য উপযুক্ত তালে কিছু গানও আমার নির্বাচন করা আছে—'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', সলিল চৌধুরীর 'ক্লান্তি নামে গো', পরেশ ধর-এর 'শান্ত নদীটি' ইত্যাদি, সেগুলো একে একে গাওয়ার উপক্রম করি—'আয় আয় আয় শেয়ালে বেগুন খায় তারা তেল আর নুন কোথায় পায়' শীর্ষক খুব করুণ গানটিতে একেবারে শেষে পৌঁছে এই পরিবেশন সমাপ্ত করব এবং শ্রোতাদের নমস্কার জানাব—এইরকম চতুর এক পরিকল্পনা করে।

ঘঞ্চু 'ফুলে ফুলে' গানের 'তটিনী হিল্লোল তুলে'-তে পৌঁছেই আমার চালাকি ধরে ফ্যালে। সে বুঝতে পারে যে, এই টাক মাথা বুড়োটা তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে বিশ্বপর্যটনের জন্য লোকটার কাঁধে চড়ে বসেছে, আর সে লোক কিনা চেয়ারে শুয়ে দোল খেতে খেতে মনের সুখে হেঁড়ে গলা ছাড়ছে! এ কি একটা ভদ্র আর অনুমোদিত পদ্ধতি হল? আমরা ছাত্রজীবনে কারও কোনও কাজে গাফিলতি বা বেচাল দেখলে বা বাজে অজুহাত শুনলে বলে উঠতাম—'তা বললে তো অফিস শুনবে না!' ঘঞ্চুও যেন গানের দেড় কলিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হাত-পা ছুড়ে, পিঠে মুখ ঘষতে ঘষতে আমাকে ওই কথা বলতে থাকে—'এ কী হচ্ছে



দাদুনভাই! এ করলে তো অফিস শুনবে না!’

তার এই অবিশ্রান্ত নাচানাচি আবার সেই অশ্রুহীন ক্রন্দনে এসে আছড়ে পড়বে, আমার এমন ভয় হয়। হোক অশ্রুহীন, তবু তো ক্রন্দন। তাই আমি ভয় পেয়ে তাকে নিয়ে উঠে পড়ি এবং দোতলার জানলার কাছে গিয়ে তাকে পথ দেখতে উৎসাহ দিই। পথের একটা সুবিধে হল, পথ নিজে চলে না, কিন্তু সবাইকে চলার সুযোগ করে দেয়। তার ওপর দিয়ে লোক যাচ্ছে, শব্দ করে অটো যাচ্ছে, বাইক যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, ঘঞ্চুর চোখ সেইগুলোকে লক্ষ করে কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে থাকে।

তারপরে তাকে নিয়ে আসি ঘরের মধ্যে ঝোলানো একটা জাপানি ঘণ্টির কাছে, যাকে আজকাল বড়লোকেরা ‘মোবাইল’ বলে। তার ঝুলন্ত ইস্পাতের ডান্ডাগুলোয় মাঝখানের একটা সুতো ধরে টান দিলে টুংটাং করে বেজে ওঠে। এটাতে আমার কাঁধে থাকা ঘঞ্চু কিছুক্ষণ নিমগ্ন হয়, নিজেই হাত দিয়ে দড়িটা দোলানোর চেষ্টা করে এবং বাজনা বাজলে হেসে ওঠে। তার হাত এখনও পুরোপুরি বশে আসেনি, তবু সে চেষ্টা করে, দোলনা-ঘণ্টি বাজে আর তার হাসি মিনিট দুয়েক চলে।

তারপরেই অবাক হয়ে দেখি, হাসি থেকে কান্নায় চলে যাওয়ার একটা অদ্ভুত কায়দা সে আয়ত্ত করেছে। শুরু করল সে হাসি দিয়ে, কিন্তু তাতে সেকেন্ড দুয়েক থেকেই হঠাৎ কান্নায় পৌঁছে যাচ্ছে এবং সে কান্নাটা তখন এমন প্রবল এবং পাড়া-কাঁপানো হয়ে ওঠে যে, আমাদের আতঙ্কিত আর শশব্যস্ত করে। আমার ধারণা, এত তাড়াতাড়ি হাসি থেকে কান্নায় চলে যাওয়ার ক্ষমতা অনুপকুমারের মতো অভিনেতারও ছিল না। এইমাত্র জাপানি ঘণ্টি নিয়ে সে হাসছিল, তারপরের মুহূর্তেই তার হাসিটা একটা ক্ষণিকের মরীচিকা হয়ে গেল, তা সেই হাত-পায়ের হ্যাট-হ্যাট এবং কান্নায় রূপান্তরিত হল।

ফলে বাধ্য হয়ে তাকে কখনও কখনও ছাদে নিয়ে যেতে হয়। সেখানে সে শান্ত হয় একটু এবং বড় রাস্তার গাড়িঘোড়ার চলন, আমাদের নারকেল গাছ, তার আড়ালে লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিকে সাঁতরে চলা চাঁদ, পশ্চিমে গোধূলির রং ইত্যাদি সে দেখতে থাকে। ‘এই’, ‘আই’, ‘ইয়া’ ইত্যাদি মূল্যবান বাণীও তার মুখ থেকে বেরতে থাকে। তখন মনে হয় সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার চাহিদা এই যে, অনন্তকাল সব গোধূলি-সন্ধ্যা-রাত্রি-প্রভাত, সমস্ত দুপুর-বিকেল পার হয়ে তার এই ছাদ-পরিক্রমা চলবে দাদুনের কাঁধে কাঁধে, তার আর কোনও বিরতি ঘটবে না।

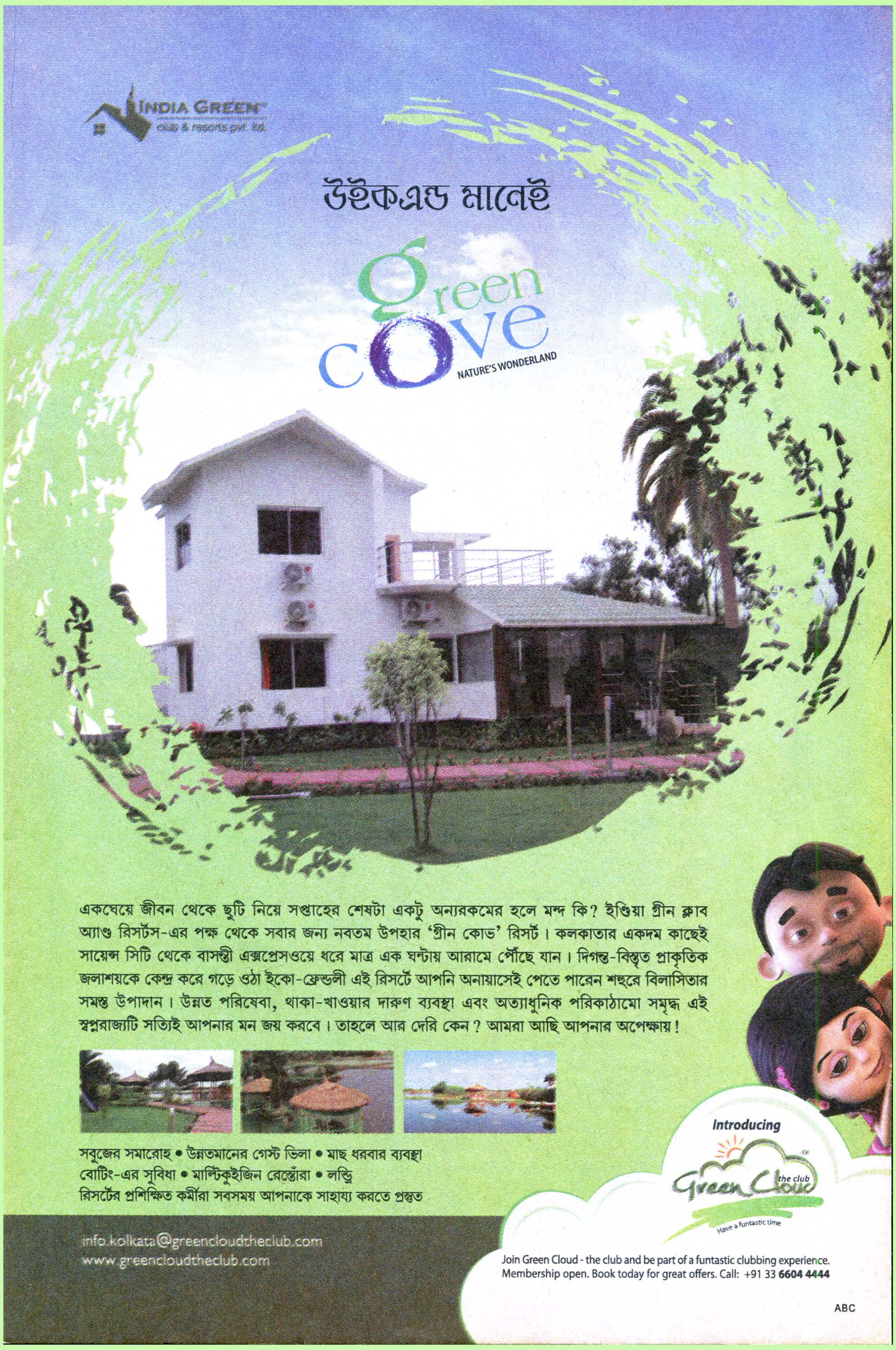
পাগল, না পেট খারাপ!—কথাটা মনে মনে বলে আমি তাকে নীচে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিই। তাতে বেশ খানিকটা থম মেরে থাকা গাম্ভীর্যের পর সে হঠাৎ উল্টে যায়। আমরা দেখে চমৎকৃত হই। পাঁচ মাস বয়স হয়েছে, অথচ এখনও সে ওল্টাচ্ছিল না, এই নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। এবার আমাদের সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে কি না জানি না, সে উল্টে যায়। আমরা আবার তাকে চিত করে দিই, সে আবার উল্টে যায়। সেই মহাভারতের শকুনির পাশার মতো, যেন তার মধ্যে কোনও কৌশল ভরে দিয়েছে কেউ—চিত করা মাত্র সে উল্টে যেতে থাকে। উল্টে গিয়ে আবার কান্না শুরু করে। আমরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, পাঁচ মাসের শিশুর এভাবে উল্টে যাওয়াটাই নিয়ম এবং সেটা একটা কৃতিত্বের ব্যাপারও বটে। যতবার উল্টোবে ততবার আমরা হাততালি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত আছি, তাই তাতে কান্নার কিছু নেই। আর তাকে বলি, তুমি মনের মধ্যে এই বিবেচনাটা রাখো যে, গড়িয়ায় এসে তুমি উল্টে গেলে, তোমার ঠাকুরদা-ঠাম্মা এটা দেখতে পেলেন না, এর জন্যে তাঁরা হয়তো মনখারাপ করবেন। তাই তুমি বুদ্ধি করে চুঁচড়োয় গিয়ে হামাগুড়িটা অন্তত শুরু কোরো, সেখানে দাঁড়াতে শুরু করলেও আমরা আপত্তি করব না। সে এসব শোনে না, উল্টে গিয়ে আবার কাঁদে, কিন্তু চিত করে দিলে ওল্টাতেও ছাড়ে না।

তবে তার আসল আর চূড়ান্ত একটা কান্না সে জমিয়ে রাখে রাত্রিবেলার জন্যে। ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ সেটা শুরু হয়। এটা তার মায়ের জন্যে কান্না, এতে রীতিমতো লিটার লিটার চোখের জল সে বার করে আনে—তার এবং আমাদের। তার মাকে হয়তো আমরা তখন খেতে পাঠিয়েছি যে, ‘যাও, আমরা ততক্ষণ সামলাচ্ছি ছেলেকে।’ মা-ও খেতে চলে যায়। কিন্তু আমাদের সাবধান করে যায়—‘দেখো, একটু পরেই হয়তো তার শোক উথলে উঠবে, দাপাদাপি, কান্না শুরু করবে। ক'দিন ধরে এই কায়দাটা সে শুরু করেছে।’ আমরা এই হৃদয়হীন মাকে ধমকে খেতে পাঠাই।

তারপরে ঘঞ্চুর কান্না শুরু হয়। প্রথমে তা ‘এই, এই’ ডাকাডাকির মতো মনে হয়, তারপরে সে হাত-পা ছুড়তে এবং চিৎকারের মাত্রা বাড়াতে থাকে। কোলে তুলে নিলে সে শান্ত হয় না, আমাদের পিঠে সে হাতের মুষ্টি দিয়ে আঘাত করতে থাকে, পেটে সেই সুমো কুস্তিগিরের পা দিয়ে। আর প্রবল অশ্রান্ত, অবিশ্রান্ত কান্না—মনে হয়, পাড়ার লোক এবার পুলিশে খবর দেবে যে, আমরা, তার নিজের দাদুন বা দাদি, একটা দুধের শিশুর ওপর কোনও নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছি। তার মা এতেও বিচলিত হয় না, খাওয়ার টেবিলে বসে বলে যে, ‘ওই, সেই খেলা আবার শুরু হয়েছে!’ সে বিন্দুমাত্র ব্যগ্র না হয়ে ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ করে।

আমরা ঘঞ্চুর দাপাদাপিতে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে যাই। এই সময় সে যেন আমাদের চেনেই না, মনে হয় সে ডাকাতের হাতে পড়েছে বা কিছু, এইরকম ভাবছে। এখানে তার দাদির সর্বরোগহর ও বিখ্যাত শেয়ালের ডাকও ব্যর্থ হয়। আমার ধারণা ছিল তার দাদির গলার চেয়ে আমার গলায় শেয়ালের ডাক আরও ভাল ও শিল্পসম্মত হয়, কিন্তু আমিও বিশেষ সুবিধে করতে পারি না। আমরা রীতিমতো অপমানিত বোধ করি এবং ঘঞ্চুকে বেশ দু'ঘা দিতে ইচ্ছে হয়।

তার মা এলে সে শান্ত হয় এবং উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের পর সে দেবশিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে। এতসব কাণ্ডের পরেও যখন সে আবার চুঁচড়োয় চলে যায়, তখন আমরা তার শূন্য খাটের দিকে, এমনকী এই বুড়োবুড়ি এর-ওর মুখের দিকে কয়েক বেলা তাকাতে পারি না।


INDIA GREEN
club & resorts pvt. ltd.
উইকএন্ড মানেই
green cove
NATURE'S WONDERLAND
একঘেয়ে জীবন থেকে ছুটি নিয়ে সপ্তাহের শেষটা একটু অন্যরকমের হলে মন্দ কি? ইণ্ডিয়া গ্রীন ক্লাব অ্যাণ্ড রিসর্টস-এর পক্ষ থেকে সবার জন্য নবতম উপহার 'গ্রীন কোভ' রিসর্ট। কলকাতার একদম কাছেই সায়েন্স সিটি থেকে বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে মাত্র এক ঘন্টায় আরামে পৌঁছে যান। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইকো-ফ্রেন্ডলী এই রিসর্টে আপনি অনায়াসেই পেতে পারেন শহুরে বিলাসিতার সমস্ত উপাদান। উন্নত পরিষেবা, থাকা-খাওয়ার দারুণ ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ এই স্বপ্নরাজ্যটি সত্যিই আপনার মন জয় করবে। তাহলে আর দেরি কেন? আমরা আছি আপনার অপেক্ষায়!
সবুজের সমারোহ • উন্নতমানের গেস্ট ভিলা • মাছ ধরবার ব্যবস্থা
বোটিং-এর সুবিধা • মাল্টিকুইজিন রেস্তোঁরা • লন্ড্রি
রিসর্টের প্রশিক্ষিত কর্মীরা সবসময় আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত
Introducing
Green Cloud the club
Have a funtastic time
info.kolkata@greencloudtheclub.com
www.greencloudtheclub.com
Join Green Cloud - the club and be part of a funtastic clubbing experience.
Membership open. Book today for great offers. Call: +91 33 6604 4444
ABC

নবনীতা দেবসেন

যব ছোড় চলে উন্নাও নগরী

উত্তরপ্রদেশের মজা তো এক জীবনে দেখে ফুরোবার নয়? ভারতবর্ষের পুরো ইতিহাস বুকে করে ধরে রয়েছে এই উত্তরপ্রদেশ তার বিশাল বপুতে, ভারতীয় সভ্যতার, সংস্কৃতির স্তরে স্তরে ওঠন-নামন-কাঁদন-হাসন, আহা, আমার বুকের ধন, ভারতবর্ষ!

'ওই ওই ওই চলে গেল রে!' কী যেন লেখা ছিল ওই লাল রঙের সিমেন্টের তোরণে, হিন্দিতে, 'কোনও একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নাও!'

—আরে আরে ওই কি রাজা রামবক্স রাও-এর সোনার খনি? চলো চলো যাই দেখি গে কত মন সোনা উঠল? দু'মুঠো পকেটে নিয়ে যাব না? 'ড্রাইভার সাব আপ জানতে হেঁ উন্নাও কিতনা দূর? অব চলিয়ে না?' (আচ্ছা, মন বেশি, না টন বেশি? ছোটবেলাতে টন তো শেখায়নি ইশকুলে! টনই বেশি হবে, নইলে তো সাধুবাবা মন—এই স্বপ্ন পেতেন। উনি তো মন মন কয়লার মতো মন মন সোনার কথা বলেননি? উনি পেয়েছেন টন টন সিমেন্টের মতো টন টনে সোনার স্বপ্ন। পারেও বাবা মহামান্য সরকার! শোভন অশোভন জ্ঞানগম্যি নেই!)

'নেহি, মেমসাব, ও জাগাহ তো ইয়ে হাই ওয়েসে চালিস কিলোমিটার তক অন্দরকা রাস্তা হ্যায়, নজদিক নেহি—বহোৎ দূর যানা হোগা—ফির কানপুর ঘুমনেমে বহোৎ রাত হো জায়েগা—'

অর্থাৎ, মাপ করুন, ও পথে যাব না! তার মানে মজা দেখা হল না! ঠিক আছে এক দিনে আর কত মজা দেখা যায়? উত্তরপ্রদেশের মজা তো এক জীবনে দেখে ফুরোবার নয়? ভারতবর্ষের পুরো ইতিহাস বুকে করে ধরে রয়েছে এই উত্তরপ্রদেশ তার বিশাল বপুতে, ভারতীয় সভ্যতার, সংস্কৃতির স্তরে স্তরে ওঠন-নামন-কাঁদন-হাসন, আহা, আমার বুকের ধন, ভারতবর্ষ!

আর আজকের উত্তরপ্রদেশ?

আমি ইতিহাসে ফেল করা মেয়ে, প্রত্যেকবার ৩০ পেয়ে পাশ করেছি, প্রতিবার ইতিহাস আমার ঠ্যাং ধরে টেনে নামিয়ে দিয়েছে আমার মোট নম্বর। অথচ এই কিচ্ছু না জানা গোল্লা পাওয়া আমিও তোমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাই—উত্তরপ্রদেশ!

চোখ বুজলে ভাবতে পারি একের পরে এক নাম, এলাহাবাদে হিন্দু প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গম, গীতাঞ্জলির প্রকাশকের ঠিকানা। বিশ্বের ইতিহাসে প্রাচীনতম জীবিত শহরগুলোর অন্যতম, উত্তরবাহিনী গঙ্গার কূলে বারাণসীধাম, রাজা দশরথের রাজধানী, সরযূ তীরের অযোধ্যানগরী, গোমতীর পারে লক্ষ্মণের লক্ষ্মণাবীত (লখনউ), একটু দূরে গেলেই গৌতম বুদ্ধের শ্রাবস্তীর জেতবন, শহরের মাঝখানে রেসিডেন্সি, বেগম হজরত মহলের দ্বারা মনোবল জাগানো আমাদের প্রথম স্বাধীনতার লড়াইয়ের, হিন্দু মুসলমান সৈন্যদের একসঙ্গে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের প্রথম কেন্দ্রবিন্দু, সাহেবদের কেল্লা, 'রেসিডেন্সি', বিতাড়িত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ ছেড়ে যাওয়া স্বপ্নের প্রাসাদনগরী, গান-বাজনা-শায়রি-কত্থক-পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগানো বাদশাহি আতর, বেগমবাহারি চিকনের সূক্ষ্ম কাজ, আর নবাবি কাবাবের শহর, বর্তমানে পরিচিত মুখ্যত পানমশলার, আর মায়াবতীর মূর্তির নগরী বলে।

বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসেরও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ গড়ে উঠেছিল এই লখনউ শহরে। যেমন একদা এলাহাবাদ শহর ছিল শিক্ষিত বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তির আশ্রয়, তেমনই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে, লখনউয়ের আদালতে-কাছারিতে, অনেক উজ্জ্বল বঙ্গসন্তান কাজ করতে এসেছিলেন। সাহিত্য, সংগীত, ইতিহাস, দর্শন, নানান দিক থেকে স্বদেশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বাংলাকে, তথা পুরো দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই লখনউয়ের বাঙালি সম্প্রদায়। অধ্যাপনায়, আইনচর্চায়, সাহিত্য-সংগীত চর্চায় সারা দেশে সম্মানিত, প্রসিদ্ধ বাঙালিরা যেখানে বসবাস করে গিয়েছেন, আমি সেই পুণ্য শহর লখনউতে থেমেছি, কানপুরের পথে।

চলেছি কানপুরের আইআইটি-তে, বক্তিমের আমন্ত্রণে। প্লেন প্রথমে থামল পাটনায়। সেখানে সম্প্রতি বোমাবাজি, প্রাণহানি, অশান্তি শুরু হয়েছে। পরের স্টপ লখনউ। ইতিমধ্যে আমি ডানদিকের অন্য লোকেদের জানলা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ দেখি, আররর-রেঃ! ওটা কে চলেছে আমাদের প্লেনের পাখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, পাশে পাশে? ঝকঝকে আকাশের গায়ে এক সারি তেকোণা খোঁচা খোঁচা পুজোর থালায় চাল, নৈবিদ্যি সাজানোর মতো, সাদা ধবধব চুড়ো নিয়ে আকাশের দিকে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরে আছে যেন? কানে ভেসে এল অনেকগুলো বচ্ছর আগেকার নীরেনদার গলা, 'যদি কখনও দিনেরবেলায় দিল্লি যাস, ডানদিকের জানলা দিয়ে দেখবি, হঠাৎ এক সময়ে হিমালয়ান রেঞ্জ দেখা দেবে। অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলবে। দারুণ দৃশ্য!' নীরেন্দ্রনাথের বলার পরে আমি খেয়াল করেছিলুম, অনেকবার দেখেওছিলুম, অমূল্য সেই নৈসর্গিক আশীর্বাদের ছবি। আজকাল বয়সের গুণপনায় সব অপূর্ব ভুলে মেরে দিয়ে, প্লেনে বসে কাজ কম্মো করি মাথা গুঁজে।

ওইটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে পাশের যাত্রিণীকে খোঁচা মেরে বলি, 'ওই যে, ওই দ্যাখো। হিমালয়।' সে ঘুম ঘুম চোখ ম্যাগাজিন থেকে তুলে একবার তাকিয়ে বলল, 'ক্লাউড্‌স'। কাগজে চোখ নামিয়ে নিল সে। আহা, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু। ক্লাউড্‌স নয়, কপালে নেই তো দেখবে কি, যা দেখতে লোক পয়সা খরচা করে সিকিম ছোটে, দার্জিলিং ছোটে। চোখ ঝলসানো ঝকঝকে তুষার চুড়োর সারি অনেকক্ষণ ধরেই চলল, তার নীচে, নীলে ভাসছিল ফুরফুরে সাদাটে ধোঁয়ার মতো মেঘ। ক্লাউড্‌স।

লখনউয়ে আমার গার্জেন ড. অনিন্দিতা চক্রবর্তী, আইআইটি-র সোশিয়লজির অধ্যাপিকা, আমার সুন্দরী তরুণী আমন্ত্রণকর্ত্রী। আমাদের প্রেসিডেন্সির মেয়ে। প্রথমে আমাদের প্ল্যান লখনউ ভ্রমণ! তার পরে গাড়ি করে ঘণ্টা দেড়-দুই কানপুর। পথে গঙ্গানদী পেরিয়ে যাব। আর উন্নাও! খননকাজে উৎসাহ দিয়ে আসব না একটুখানি সরেজমিনে দেখে—লখনউ দর্শন শুরু হল আমাদের প্রাণের জায়গা দিয়ে, শহরের সবচেয়ে প্রাচীন বইয়ের দোকান। রাম আডভানি, বুক সেলার্স!—স্বাধীনতা পরবর্তী লখনউতে প্রথম দেশি-বিদেশি ইংরেজি বইয়ের দোকান। উত্তর প্রদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আমরা ঢুকে দেখি জনা তিনেক সেল্‌সম্যান-উওম্যান রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এক সম্ভ্রান্ত শুভ্রকেশ শুভ্র শমশ্রু সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে বললেন, 'আসুন, আসুন, কী রকম বই চাই?'

'আপনি কী—' অনিন্দিতার প্রশ্নের আগেই উত্তর চলে এল—'আমি রাম আডবানি, নমস্কার!' এঁর নামেই বই দোকান, ইনিই প্রথম মালিক, স্বয়ং ৬৪ বছর ধরে দোকানে আসছেন।

কথায় কথায় বেরুল। তাঁরই পুত্র রুকুন আর পুত্রবধূ অনুরাধা 'পার্মানেন্ট ব্ল্যাক' পুস্তক প্রকাশনা তৈরি করেছেন। ওঁদের অনেক দিন চিনি, ওঁরা ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে, দিল্লিতে। রুকুনের বই-প্রেমের শিকড় তা হলে এইখানে? শ্রী আডভানি গল্প করছিলেন, বিদেশে উনি যাটের দশক থেকে যাচ্ছেন, ইংল্যান্ড কত বদলেছে, শহরগুলোর চেহারা পালটে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু এখন শহরতলিতে, গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট বইয়ের দোকান খুলছে মানুষ, বই বিক্রি হচ্ছে, বইয়ের দোকান দেওয়াটা একটি সম্ভ্রান্ত পেশা হয়েছে। মন্দের মধ্যে ভালও আছে। হ্যাঁ, অপুও বলছিল ভারতেও শহরতলিতে বই দোকান দেওয়া শুরু করেছেন বাংলার প্রকাশকেরা, পুস্তক বিক্রেতারা। নন্দনার ভাসুর ডেভিডের তো সুন্দর একটি ছোট বইয়ের দোকান আছে ইংল্যান্ডে। কেমব্রিজের অনেক গপ্পো করলেন রাম। অন্তরাকে চিনতে পারলেন, 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নামটি বলা



মাত্রই। দু'জনে দু'টো করে চারটে সুন্দর সুন্দর বই কিনে রওনা হলুম।

এবারে সব কিছুই। বড়া ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, ছোটা ইমামবাড়া, রুমি দরওয়জা, আসিফি মসজিদ এই সব নবাবি ঐতিহ্য দেখে আসতে গেলুম। দেখা মানে বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ মুখে দেখা, অসামান্য কারিগরি, বড় বড় উঠোন পেরিয়ে প্রবেশের ক্ষমতা নেই পদযুগলে। দেখে দেখে আঁখি না ভরে! শিয়াদের রুচির মধ্যে যেন একটা আলাদা শান্ততা আছে।

মুসলিম যুগের নবাবি প্রাসাদ অঞ্চল দেখে যাওয়া হল সাহেবি উপনিবেশের পিরিয়ডে। রেসিডেন্সি-তে। যেখানে হিন্দু-মুসলিম একত্রে প্রথম লড়াইটা শুরু করেছিল ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে। লখনউ থেকে বেগম হজরত মহল সৈন্যদের দিয়েছিলেন মনোবলের নেতৃত্ব। এখানে অনিন্দিতা ঠেলাগাড়ি সংগ্রহ করলেন এবং আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ভিতরে ঢুকে গোলাগুলি খাওয়া ভগ্ন প্রাসাদগুলোতে ঔপনিবেশিক গুছিয়ে বসা-র চিহ্ন দেখলেন। অনিন্দিতা নন্দনার চেয়ে অল্প ছোট, টোটোর ক্লাসমেট পাঠভবনে। এবারে আমাদের গন্তব্য হজরতগঞ্জ।

প্লেনে পাইলট বলে দিয়েছিলেন লখনউতে আমিনাবাদের কাবাব খেতে ভুলো না! কিন্তু ড্রাইভার বললেন অন্যরকম। আমিনাবাদ এখানেই, কিন্তু তার সরু সরু গলিতে গাড়ি ঢুকবে না, পার্কিং-ও হবে না আমিনাবাদে। প্রচণ্ড ভিড় সঙ্গে থাকবে। আর খাবার জায়গাগুলো গরম, অপরিচ্ছন্নও হতে পারে। (আমার তো ভারি বয়েই গেল তাতে!) তার চেয়ে হজরতগঞ্জে যাও। তাই সই।

সেই হজরতগঞ্জে ক্লার্ক হোটেলের রুফ টপ-এর রেস্তোরাঁতে বসে লাঞ্চ হল। নীচে প্রাচীন লখনউ শহর দেখা যাচ্ছে, আর দূর অবধি ছড়ানো রূপমতী গোমতী নদী। কী লাঞ্চ? এই হজরতগঞ্জের শ্রেষ্ঠ অবদান, কাবাব, মাখনের মতো মোলায়েম গলৌটি কেবাব! কী, জিবে জল? আর অসাধারণ ফিশ অবধি, অর্থাৎ অযোধ্যার মৎস্য। কিন্তু সরযূর নয়, অপরূপা গোমতী নদীর মাছ। নদীর শোভা বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। দারুণ নবাবি খানা হল তন্দুরি রোটি আর হরেক আচার দিয়ে। নো স্পেস ফর মিষ্টান্ন।

হলে কী হবে? সর্বক্ষণ ফোন আর মেসেজ আসছে, সই-মেলা নিয়ে। অনিন্দিতা খ্যাপাচ্ছেন, আমার শরীর এখানে, মন তো ভালো-বাসা বাড়িতে দৌড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, এবং ক্লান্ত। ভালো-বাসা বাড়ি এখন আমাদের অতি প্রিয় উৎসব, 'সই-মেলা বই-মেলার' কর্মক্ষেত্র হয়েছে, 'সই-সম্মান' প্রদানের স্বপ্ন দেখা চলছে। ভারতীয় ভাষার কোনও একজন বিশিষ্ট লেখিকাকে দেওয়া হবে এই শ্রদ্ধার্ঘ। এরকম কোনও পুরস্কার ভারতে নেই। সই-মেলা-তে আগের 'সই-মেলা, বই-মেলা'গুলোর মতোই এবারেও থাকবে শুধুই মেয়েদের লেখা, মেয়েদের দ্বারা প্রকাশিত, মেয়েদের দ্বারা সম্পাদিত বই, পত্রপত্রিকা, শুধু বাংলার নয় সারা ভারতের মেয়েদের।

জানি না কতদূর কী পেরে উঠব, তবে চেষ্টা করছি। দশজন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার লেখিকা আমাদের আমন্ত্রণে আসতে রাজি হয়েছেন। মেয়ে প্রকাশক মেয়ে সম্পাদক, যাঁরা এটা পড়বেন, দয়া করে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডকে যোগাযোগ করুন, বই সাজানো নিয়ে। এটা মেয়েদের বইয়ের প্রদর্শনী—এবং সঙ্গে বিক্রি। এবারে সই-এর প্রিয় কয়েকজন নারীশিল্পীর আঁকা ছবি, ভাস্কর্য ও ফোটোগ্রাফিও থাকবে। এসব বন্দোবস্ত পাকা, আইসিসিআর মঞ্চ ২৪ নভেম্বর সকালে বুকড 'সই সম্মানের' জন্য। আর ওখানেই যামিনী রায় গ্যালারিতে ২৪-২৬, মেয়েদের বই শিল্প কলা প্রদর্শনী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলবে রোজ সারাদিন ধরেই, ১১-৭টা অবধি। আপনারা সব্বাই আসবেন। জানি, হো চি মিন সরণিতে আসতে একটু অস্বস্তি হয়, ব্যারিকেড দেখে ভয় ভয় করে, কিন্তু মাভৈ, 'আইসিসিআর-এ যাচ্ছি' এই অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করলেই পথের মধ্যের প্রশ্নকর্তা পুলিশ আপনাদের আসতে দেবেন।

স্বপ্ন তো সুন্দর, সাড়াও মিলেছে প্রচুর, কিন্তু সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য এক পয়সাও সংগ্রহ হয়নি এখনও, তাই নিয়ে জল্পনা-ভাবনা ও পরিশ্রম চলছে। আমাদের গভীর বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ কাজে অর্থের অভাব শেষ অবধি হয় না। বাংলার, তথা ভারতের মেয়েদের বহুমুখী সৃজনশীলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার বাইরে 'সই-মেলা বই-মেলার' আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। কানপুরের আইআইটি অত্যন্ত সুন্দর। ময়ূর এবং নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মাঝখানে। সবুজ, ফাঁকা, নিরাপদ, এবং মনোহরণকারী। কী বড় বড় খেলার মাঠ, কোর্ট, সাঁতারের জলাশয়! আর একরকমের সুন্দর গুয়াহাটি আইআইটি ক্যাম্পাস। এখানে বাঙালি ছাত্রদের উদ্যোগে কালীপুজো হচ্ছে, অভীরু বসু (সুনির্মল বসুর নাতি) আর সায়নদেব সিন্‌হা জানালো, 'ঠাকুর এসে গেছে!' এরা দু'জনে আমার পাশে পাশে আছে সারাদিন, এই কম্পিউটার সারাদিন ধরে বিগড়েছে আর ওরা তাকে বাগ মানিয়েছে। এবারের লেখা খুব কষ্ট করে হল। দু'বার উড়ে গেল। ত্রুটিবিচ্যুতি মাপ করে দেবেন। বক্তিমে ভালই হল, প্রচুর আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আমি তো মদরে উঠেছি, প্রশ্নোত্তর আর ফুরোচ্ছেই না! এরাও ভাবেননি এত শ্রোতা হবে আমিও না! দারুণ এক কেরালা ডিনার খেলুম অনিন্দিতাদের বাড়িতে। তার শ্বশুরবাড়ি কেরালায়, শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছেন, বউমার সুবিশাল প্রাসাদোপম কোয়ার্টারে বেড়াতে। এমন ফ্ল্যাট কলকাতায় অকল্পনীয়। খুব ভাল লাগল। আমাদের প্রচুর পরিচিত কেরলীয় বন্ধু বেরুলেন, এত কেরালার বন্ধু ছিল আমার, হিসেব করিনি কোনওদিন! পৃথিবী কত বুকের কাছাকাছি এসে পড়েছে মা সরস্বতীর কৃপায়!

আজকের কলাম এখানেই সারা হোক। যন্তরের পরের বারের বিগড়োনোর সময় এসে যাচ্ছে!

আমাকে প্লেন ধরতে হবে, তার আগে বিঠুর বেড়িয়ে নিতে চাই। সায়নদেব গাড়ি সহ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, এটি পাঠিয়ে তবে রওনা! ছেলেটির বাংলা সাহিত্য পাঠ অবাক করে। অথচ পড়াশোনা করে বিজ্ঞানে।

আসার পথে উন্নাও হল না, কিন্তু আজকেই তো ধনতেরাস! আজ নিশ্চয়ই এএসআই সোনা তুলে ফেলবেন। এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে আর একবার 'জয় স্বপ্নসন্ধানী সাধুবাবা!' বলে একমুষ্টি সোনার চেষ্টা করে যেতেই হবে! শুভ দীপাবলি!

০২.১১.২০১২, কানপুর

nabaneetadevsen@gmail.com



ITC
Enduring Value
Vivel
আপনার ত্বকের জন্য ডিপ নারিশমেন্ট
ভিভেল নিয়ে এলো এক অনন্য স্কিন নারিশিং রেঞ্জ,
ভিটামিন-ই এবং প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ।
ভিটামিন-ই ত্বকের গভীরে# গিয়ে পুষ্টি যোগায় এবং
আপনাকে দেয় এক কোমল, পরিপুষ্ট উজ্জ্বলতা।
ভিটামিন ই-র কার্যকারিতা*:
ত্বকের গভীরে# গিয়ে পুষ্টি যোগায়
ত্বকের গভীরে# গিয়ে কাজ করে
VITAMIN E*
Vivel refresh+ moisturize
Vivel mixed fruit+ cream
• papaya
• avocado
• pomegranate
Vivel aloe vera
Vivel green tea
নতুন স্কিন নারিশিং রেঞ্জ
LAW & KENNETH
*Refers to Tocopheryl Acetate | #Action on Stratum Corneum

এসো বসো আহারে

"ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে...।" লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 'সচিত্র মাসিক পত্রিকা' কেমন হতে পারে, কোন অত্যুচ্চ মানে পৌঁছতে পারে—'সন্দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তার নজির রেখেছেন পাতায়-পাতায়।

'ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা'—প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রচ্ছদের ওপর মুদ্রিত। সেটাই আজও এই পত্রিকার 'Catch-line'—অর্থাৎ এক চিরায়ত সার্থকতা। মুখ ঢেকে যাওয়া বিজ্ঞাপনের যুগেও ওই 'Catch-line' শুনলে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ' পত্রিকা ছাড়া অন্য কিছু মনেও আসে না। কী ছিল সেই 'সন্দেশ'-এ, কী ছিল উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনার দক্ষতায়?

> ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশন।'
>
> —বাংলা শিশু সাহিত্য : বুদ্ধদেব বসু

সামগ্রিক সন্দেশ সম্পর্কেই এই মন্তব্য বুদ্ধদেব বসুর।

'মনোহরণ রঙিন ছবি', 'আশ্চর্য মলাট' আর 'সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে'-র যে-মিশ্রণ—সেই মিশ্রণকে সঠিক অনুপানে মিশ্রিত করার 'কাজ'-এর পুরোহিত ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। বৈশাখ ১৩২০ (ইংরেজি ১৯১৩)-তে প্রকাশিত হল প্রথম 'সন্দেশ' পত্রিকা। এর আগে ছোটদের জন্য পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা ১৮১৮ থেকেই লক্ষ করা যায় : 'বালকবন্ধু', 'বালক সখা', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল', 'অঞ্জলি' এসবের মধ্যে। ছোটদের জন্য উপেন্দ্রকিশোর নিজেও কলম ধরেছিলেন এই পত্রিকাগুলোতেও। তখন তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় হাত দিচ্ছেন, ভাবছেন। শিশুদরদি উপেন্দ্রকিশোরের পরিচয় তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারার মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল।

> তখন উপেন্দ্রকিশোরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তখনকার দিনে পঞ্চাশ বছরের লোককে বৃদ্ধ বলা হত।... উশ্রীর ধারে বিরাট বালির চর। বিকাল চারটে বাজতেই জ্যাঠামশাই বারগেন্ডার সমস্ত ছেলেমেয়েদের জড়ো করে উশ্রীর চরে নিয়ে যেতেন। তারপর শুরু হতো নানারকম খেলা। এইসব খেলাও উদ্ভাবন করতেন উপেন্দ্রকিশোর নিজে। একটা খেলা আমাদের খুব ভালো লাগতো। খেলাটার নাম ছিল "যষ্ঠি হরণ"—মানে লাঠি চুরি করা। আর সব চাইতে মজা হলো, উপেন্দ্রকিশোর লাঠিটাই আমাদের চুরি করতে হতো—একজন হতো লাঠির পাহারাদার। চোর লাঠিটা চুরি করে নিতে পারলে, পাহারাদারদের শাস্তি হতো ষোলো বার লাফানো। বাচ্চাদের ব্যায়ামের জন্যই উনি 'লাফানো' শাস্তিটার ব্যবস্থা করেছিলেন।...দিদি লাফাতে চাইতো না। জ্যাঠামশাই ওর জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা হল দিদি একটা গান গাইবে। উপেন্দ্রকিশোর দিদির গান ভালবাসতেন বলেই ওর এই শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।
>
> —উপেন্দ্রকিশোর ও মসূয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প : হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অর্থাৎ শিশুমনের বৈচিত্র্যের সুলুকসন্ধান নিজের মধ্যেই খুঁজে-পেতে সাজিয়ে রেখেছেন—শুধুমাত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশের অপেক্ষা। বৈচিত্র্যের সন্ধানই শেষকথা নয়, তাকে শিশুমনের অন্দরে-অন্দরে শিশুসুলভ চিন্তাধারায় প্রয়োগ নৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই মূল দক্ষতা—সেখানেই উপেন্দ্রকিশোরের সার্থকতা—'সন্দেশ'-এর সাফল্য। এও যেন লুকিয়ে ছিল তাঁরই স্বভাবের মধ্যে।

> স্কুলে লেখাপড়া করতাম, বাড়িতে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়তাম, কিন্তু বাবার কাছে গল্পের মত করে মুখে, মুখে কত কি শিখতাম, সেটাই সবচেয়ে ভাল লাগত। সহজ বিজ্ঞানের কথা, পৃথিবীর জন্মকথা, চাঁদ-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা; এমন কত কি। ...এমন সহজ আর সুন্দর করে বাবা বলতেন যে কত সময়ে একজিবিশন কিংবা মেলায় গিয়ে দেখেছি, আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ঘিরে একটা ছোটখাটো ভীড় জমা হয়ে যাচ্ছে। বাবা আমাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চারদিক থেকে লোকে ঝুঁকে পড়ে হাঁ করে তাই শুনছে।'
>
> —ছেলেবেলার দিনগুলি : পুণ্যলতা চক্রবর্তী

২

কী থাকত এই 'সন্দেশ'-এ, কী বৈচিত্র্যের সন্ধান এর মধ্যে পেতে পারে শিশুমন, কতটা তার আগ্রহের স্থায়িত্ব থাকে?

> একদিন শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি পড়ছে, আমরা খেয়ে দেয়ে ছাতা নিয়ে দুপুরে স্কুলে রওয়ানা হচ্ছি, এমন সময়ে বাবা তাঁর বালিশের তলা থেকে চারখানা পত্রিকা আমার হাতে দিলেন। তাকিয়ে দেখি মলাটে চমৎকার রঙিন ছবি আঁকা—উপরে বড় বড় করে লেখা 'সন্দেশ' নীচে লেখা 'উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত'। আরে এ যে কল্পনাই করতে পারি নাই,—সত্যি, খাবার সন্দেশ পেলেও যে এত আনন্দ হোত না। স্কুলে পড়াশোনায় মন লাগল না, কখন বাড়ী যাব আর 'সন্দেশ' পড়ব এই চিন্তা। বাড়ী ফিরে এসে সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেলাম। আরে এতো অদ্ভুত বইয়ের কথা তো ধারণাই করতে পারি নাই—কী সুন্দর ছবি, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, আমায় যেন এক নতুন রাজ্যে নিয়ে গেল।
>
> প্রতি সংখ্যাতেই প্রথমেই রঙীন ছবি আর ভিতরে গল্পের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে সব মজার মজার টুকরো ছবি। ...এই 'সন্দেশ' আমার জীবনে একটা রঙীন আনন্দময় যুগ নিয়ে এল।'
>
> —জীবন খাতার কয়েক পাতা : সুনির্মল বসু

উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছিলেন দু'বছর সাত মাসে মোট ৩২টি সংখ্যা। ক্রাউন (১৫×২০ ইঞ্চি) মাপের কাগজে Quarto ভাঁজের এই পত্রিকাতে পাতার মাপ ছিল ৬.২৫×৮ ইঞ্চি। পাতায় মুদ্রিত অংশের মাপ ১২.৫×১৭ সেমি। প্রতি পাতায় Running head বাদে থাকত ২৮ লাইন করে এবং ওপর-নীচে, বাঁ পাশে সাদা মার্জিন ছাড়া থাকত ২ সেমি, ডানপাশে ২.৫ সেমি করে। প্রথম দু'বছর ১২টি করে সংখ্যা ও তৃতীয় বছরে (১৩২২) অগ্রহায়ণ-এর অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত। পৌষ



১৩৩২ আশ্বিন সংখ্যার 'সন্দেশ'-এর প্রচ্ছদ। শিল্পী : সুকুমার রায়



'সন্দেশ'-এর চতুর্থ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন, আশ্বিন ১৩৩২

১৩২২-এ সম্পাদনার ছোঁয়া সামান্যই অনুভূত হয়—আগের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর তারিখই (৪ পৌষ, ১৩২২) তা বলে দেয়।

> উপেন্দ্রকিশোরের বাহান্ন বছর বয়স, কিছুদিন থেকে শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। ডাইবিটিস রোগ, চিনি খাওয়া বারণ, একমাত্র ভালো ওষুধ ইনসুলিন সে তখনো বার হয়নি। অন্য যা ছিল সে পাওয়া ক্রমে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, যুদ্ধের জন্য চালান বন্ধ।
>
> যে মানুষটা চিরকাল নিজেই সব কাজ করে এসেছেন, তিনি এবার 'সন্দেশ'র ভার দিলেন সুকুমার সুবিনয়ের উপরে।'
>
> —উপেন্দ্রকিশোর : লীলা মজুমদার

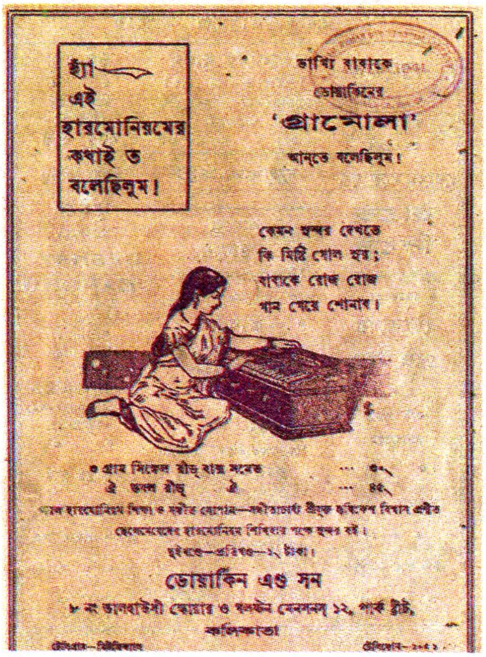
লেটার প্রেসে ছাপা, ভিতরে 'রঙিন ছবি'। প্রচ্ছদ মুদ্রণও মনোরম রঙিন। 'পাইকা' টাইপ-এ ছাপা 'সন্দেশ'-এর পাতাসংখ্যা ৩২টি—ছাপাখানার ভাষায় আট পেজি ফর্মার চার ফর্মা বই। লেখা-ছবি সব মিলিয়ে, সম্পাদনা করে, প্রতি মাসে ৩২ পাতায় বিষয়বস্তুকে ধরে রাখার অসামান্য প্রচেষ্টার ফসল 'সন্দেশ'। আশ্চর্য যে, উপেন্দ্রকিশোরও সম্পাদনা করেছিলেন ৩২টি সংখ্যার 'সন্দেশ'। তারপর সুকুমার-সুবিনয় হাল ধরেন। শিশুদের মনস্তত্ত্বের কথা মাথায় রেখে প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় রঙিন করা ছাড়াও ছবি-ব্যবহারে অসামান্য বাণিজ্যিক মুনশিয়ানা ছিল—ছোট ছেলেমেয়েরা 'সন্দেশ' হাতে নিয়ে পড়ছে এই ছবি যেন অন্য ছোটদেরও কাছে টেনে নিত, তাদেরই বন্ধুর মতো হয়ে উঠত। আর অভিভাবকরাও যাতে অনায়াসে সেই পত্রিকা কিনে দিতে পারেন—ছোটদের জন্য সেই উদ্দেশ্যও সফল। পত্রিকা খুলেই প্রথম পাতার আগে একটি আর্টপেপারে মুদ্রিত রঙিন ছবি যা Frontispiece নামে পরিচিত ছিল—তা উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা পুরাণের গল্পের ছবি; বা পাখি, ভুলো কুকুর, যুদ্ধজাহাজ; বা পথের ধারের অজানা ফুল; বা সমসাময়িক সম্রাট পঞ্চম জর্জ—ছবির বৈচিত্র মুগ্ধ করে দিত। অবশ্যই যে-ছবি থাকত, তার পরিচয়-বর্ণনা ভিতরের লেখার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হত, যাতে ছোটদের বুঝতে না অসুবিধা হয়—সম্পাদনার এক আশ্চর্য গুণ। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর যে-গুণটি আজও চমকে দেয়, তা হল ভাষার সারল্য। একটা ছোটদের পত্রিকায় এত বিচিত্র বিভাগ, এত বিচিত্র বিষয়ের প্রকাশ এবং সেসব যাতে ছোটরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তদনুরূপ ভাষায় লেখা হত সেগুলো। ছড়া, কবিতা, গল্প, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, প্রবন্ধের এক অসামান্য নির্বাচিত সংকলন। বিশেষত ১৯১৩-'১৪ সালে যে-ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষামূলক প্রবন্ধ 'সন্দেশ'-এ ছোটদের উপযোগী করে প্রকাশ করা হয়েছিল, তা উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আর সে-লেখার অধিকাংশই তিনি নিজে লিখছেন, ছবি-সহযোগে। প্রথম সংখ্যায় 'উত্তর ও দক্ষিণ' নামে লেখায় আশ্চর্য দক্ষতায় ছোটদের মনে গেঁথে যায় জ্যোর্তিবিদ্যার খবর, রাতের আকাশের তারা থেকে ভূগোলকের বিবরণ। নিজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ছেলেমেয়েদের যেভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন তারই মুদ্রিত প্রয়াস 'সন্দেশ'-এর পাতায়। 'সন্দেশ'-এর প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশ হল একটি লেখা যার নাম 'লাট্টু'—যেখানে ছোটদের বোঝানো হচ্ছে axis কী, মেরু কাকে বলে, লাট্টু কী করে ঘোরে—শুধু ছোটরা কেন, এ তো বড়দেরও অজানা! আর সেই অজানাকে জানানোর জন্য ব্যবহৃত প্রাঞ্জল, সহজ-সরল ভাষা প্রমাণ করে সম্পাদকের অসামান্য দক্ষতাকে। কত যে বিচিত্র প্রবন্ধ এবং ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন সেখানে—শুধুমাত্র শিশুমনের জানার আগ্রহকে উসকে দেওয়ার জন্য—তার তুলনা হয় না। Optical Illusion নিয়ে প্রকাশ হচ্ছে চোখের ধাঁধা (আশ্বিন ১৩২০)। যেখানে animation-এর সামান্য আভাস দেওয়া রয়েছে ছোটদের মনের মতো করে। 'অদ্ভুত ফোয়ারা' (অগ্রহায়ণ, ১৯২০), 'আকাশের নৌকা' (পৌষ ১৩২০), 'সূক্ষ্ম হিসাব' (মাঘ ১৩২০), 'ঘূর্ণীবায়ু' (ফাল্গুন ১৩২০), 'তাইকো ব্রাহী' (ফাল্গুন ১৩২০), 'সাপের খাওয়া', 'শিকারী গাছ' (চৈত্র ১৩২০), 'নূতন বৎসর' (বৈশাখ ১৩২১), 'কাগজ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১), 'পৃথিবীর আকার প্রকার', 'লুপ্ত শহর' (আষাঢ়, ১৩২১), 'ডুবুরি জাহাজ' (শ্রাবণ ১৩২১), 'বরফের দেশে সিনেমাটোগ্রাফ', 'চোখের কথা' (ভাদ্র ১৩২১), 'ছায়াবাজী' (আশ্বিন ১৩২১), 'উঁচু বাড়ী' (মাঘ, ১৩২১), 'কুয়াশার কাজ' (ফাল্গুন ১৩২১), 'রাবণের চিতা' (ফাল্গুন ১৩২১), 'আরশির কথা' (অগ্রহায়ণ ১৩২১), 'অদ্ভুত ভ্রমণকারী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২), 'পাহাড়ের দাঁত' (শ্রাবণ ১৩২২), 'সিন্ধুক ঘর' (আশ্বিন ১৩২২)—এরকম আরও অনেক-অনেক বিচিত্র প্রবন্ধ। নাম দেখেই বোঝা যায় কী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাধারায় বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি বিচিত্র প্রবন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি থাকতই, সে Halftone বা Line Drawing যাই হোক না কেন।

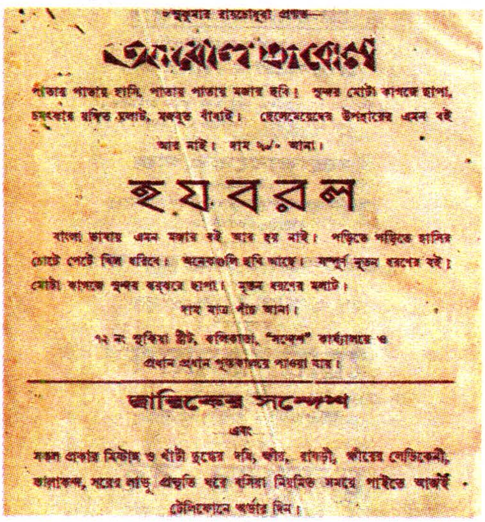
> উপেন্দ্রকিশোরের লিখিত প্রবন্ধ ও গল্পের ভাষা শিশু ও কিশোরের মনের মতো করিয়া রচিত হইত। বৈজ্ঞানিক বিষয়েও সেই একই ধারা চলিত। উপরন্তু তাঁহার চিত্রাঙ্কণে অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাষা যেখানে সীমায় পৌঁছাইত সেখানে তাঁহার আঁকা ছবি শিশু ও কিশোরের মনকে লইয়া যাইত আরও আগে। কি গল্পের চরিত্রে বা ঘটনা, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—'অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকা লেখার বর্ণনায় ও ছবির আকারে-প্রকারে সে সকলের মর্মকথা অতি সহজেই আরত্ত করিতে পারিত।'
>
> —উপেন্দ্রকিশোর : কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩

সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের অন্য এক অসামান্য সংযোজন


Keo Karpin
স্ট্রেস বাড়লে বাড়ুক, বয়েস বাড়ছে না !
NON STICKY
১০ গুণ বেশি BEAUTY HERBS
নতুন Keo Karpin Herbal Body Oil
এতে আছে ১০ গুণ বেশি* হলুদ, নিম, দারুহরিদ্রা, অর্জুন ও মঞ্জিষ্ঠার মতো অনন্য beauty herbs যা ত্বক রাখে টানটান, মসৃণ ও উজ্জ্বল, কোনো তেলতেলে ভাব ছাড়াই। এবার সারাদিন মেতে থাকুন চন্দনের fresh সুগন্ধে। আর প্রতিদিনের ব্যবহারে শীত, রোদ ও দূষণের সঙ্গে বয়সের চিহ্নও দূরে রাখুন, সারা বছর।
চিরদিন young স্কিন
Keo Karpin
HERBAL BODY OIL
SANDAL
with OLIVE OIL NEEM & HALDI
এখন 500 ml প্যাকেও উপলব্ধ
*সাধারণ আয়ুর্বেদিক বডি অয়েলের তুলনায়
Rediffusion-Y&R/Kol/Dey's/2569A





'ধাঁধা'। শিশু-মনের 'Logical Sense of mind' তৈরি এবং বিকাশের জন্য 'ধাঁধা' অপরিহার্য। শুধু বুদ্ধির বিকাশ, মাথা খাটানো নয় তখনকার সময়ে একটা ছোট ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রিকায় Recreational Mathematics-এর সমস্যা প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করা অভাবনীয় কাজ। 'দাদা, মাস্টার অঙ্ক করাচ্ছে রে!'—আদর্শকে ভেঙে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হচ্ছে :

> একটি বাগানে একটি (মুখ খোলা) পীপের মধ্যে খানিকটা জল ছিল। একজন লোক সেই বাগানের মালীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বলতো; পীপের ঠিক অর্দ্ধেকটা ভর্তি কি না? মালীর কাছে জল মাপিবার কোন পাত্র ছিল না, যন্ত্র ছিল না, অথচ যে কোন উপায়ে বলিয়া দিল যে পীপেটি ঠিক অর্ধেক ভর্তি। বলো তো, কি উপায়ে সে ইহা ঠিক করিল?
>
> ধাঁধা : সন্দেশ (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

মগজাস্ত্র শানানোর এরকম অজস্র খেলা সম্পাদকের বুদ্ধিমত্তায় প্রকাশিত হয়ে শিশু-কিশোরদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করেছে।

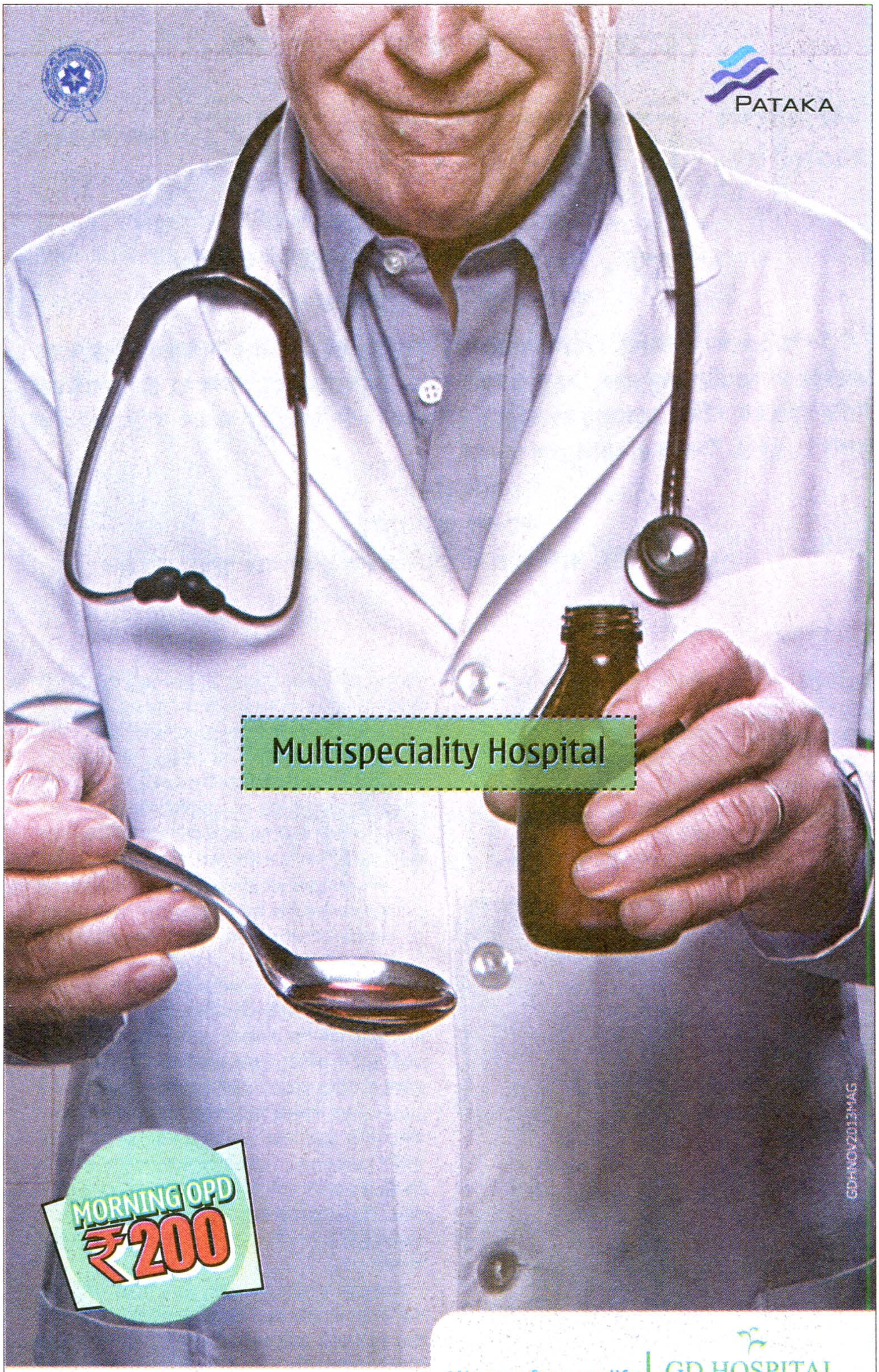
পৌরাণিক কাহিনির গল্প যে কোনও দেশের অনন্য সম্পদ। সুলিখিত, সুচিত্রিত ভঙ্গিতে সেই সব পৌরাণিক কাহিনির উপস্থাপনা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের অন্যতম প্রধান অবদান। যেখানে প্রকাশিত হচ্ছে 'পৃথিবীর পিতা' (বৈশাখ ১৩২০), 'জাপানী দেবতা' (শ্রাবণ ১৩২০), 'গণেশ' (অগ্রহায়ণ ১৩২০), 'অগস্ত্য' (মাঘ ১৩২০), 'গঙ্গা আনিবার কথা' (চৈত্র ১৩২০), 'পিপ্পল্লাদ' (পৌষ ১৩২১), 'বিষ্ণুর অবতার' (ভাদ্র ১৩২২) ইত্যাদি। উপেন্দ্রকিশোরের চিত্রশিল্পের দক্ষতা এসব পৌরাণিক কাহিনির চিত্রায়ণে এবং মুদ্রণশিল্পের সৌকর্যে প্রতিটি সংখ্যায় ফুটে উঠেছিল। U Ray & Sons যে রঙিন এবং Halftone ছবি মুদ্রণে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রমাণ 'সন্দেশ'-এর পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে।

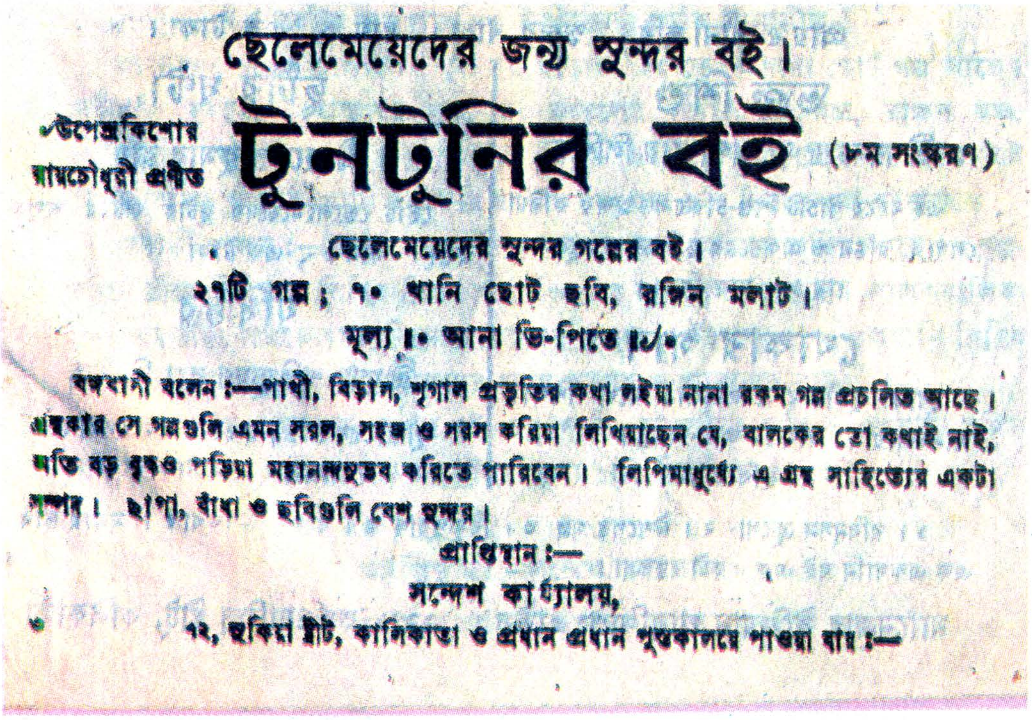
> ছবি আঁকিয়ে উপেন্দ্রকিশোর এর সবচেয়ে আশ্চর্য দু'টি গুণ হল তার বহুমুখিতা—Versatility এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পের সফল সমন্বয়। তিনি প্রধানত দু'রকম ছবি এঁকে গেছেন। এক হলো তার শখের তৈলচিত্র যার অধিকাংশই হলো Landscape —আর দ্বিতীয় তাঁর illustration।...ভাবে ও রীতিতে এই সব তৈলচিত্রের একেবারে বিপরীত হল তার illustration। একদিকে বিলিতি একাডেমিক শিল্পের প্রভাব, অন্যদিকে জাপানি উডকাট, রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার ও বাংলার লোকশিল্প এবং আরও অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি সব মিলে এমন একটি ভঙ্গির উদ্ভব হয়েছিল যা উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব ভঙ্গি এবং যার ফলে তাঁর ছবি দেখলে কখনোই অন্য লোকের আঁকা বলে ভুল হতো না। সন্দেশের প্রথম তিন বছরের সংখ্যাগুলোয় এবং সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রণীত হিন্দুস্থানী উপকথায় তাঁর শেষ দিকের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়।
>
> —উপেন্দ্রকিশোর : সত্যজিৎ রায়

গল্পের তালিকা আর বিষয়-বৈচিত্রও ছিল ভাবার মতো। মানুষটি যে গল্প বলতে, গল্প করতে সব সময়ই ভালবাসতেন তাঁর সম্পাদনায়, তাঁর লেখায় সে-প্রমাণ সব ক'টি সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে। কী ভূতের গল্প, কী রূপকথা, কী হাসির গল্প সবেতেই শিশুমনের সরল বিস্ময়মাখা চাউনির প্রত্যুত্তর—সঙ্গে সেই মনকাড়া ছবির সমাহার—কোথাও Halftone কোথাও Line Drawing-এ। জীবজন্তুদের নিয়ে গল্পেরও এক সোনার খনি উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'। সে-গল্পের ছবি, ভাষা সব সময়েই যে কোন শিশুর মনে গেঁথে যায়। 'জোলা আর সাত ভূত' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০), 'হাবুর বাবুগিরি' (লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'ফুল পরী' (১৩২০), 'শেয়াল রাজা' (আষাঢ় ১৩২০), 'পণ্ডিতের কথা' (ভাদ্র ১৩২০), 'চিল মা' (আশ্বিন ১৩২০), 'বানর রাজপুত্র' (অগ্রহায়ণ ১৩২০), 'বোকা তাঁতী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১), 'ঠানদিদির বিক্রম' (ভাদ্র ১৩২১), 'পাজি পিটার' (কার্তিক ১৩২১), 'ঝানু চোর চানু' (অগ্রহায়ণ ১৩২১), 'গুপী গাইন' (চৈত্র ১৩২১), 'ছোটভাই' (আষাঢ় ১৩২১), 'কুঁড়ো আর ভূত' (আশ্বিন ১৩২২) ইত্যাদি অজস্র বৈচিত্রপূর্ণ গল্প ছাপা হয়েছে। মান্যতা দিয়েছেন সেসব লেখককে যাঁরা ছোটদের মনের মতো করে লিখতে পারঙ্গম—এটাও এক মস্ত বড় গুণ সম্পাদনার। রায়চৌধুরী পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনরাও সেকালে শিশুজগতে লেখার মহলে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতেন—

> সন্দেশের কাছে সবাই সমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিজয়রত্ন মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।....তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনরা তো ছিলোই। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাইরা, যোগেন্দ্রনাথ বসু ও নরেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর ছেলেমেয়েরা, উপেন্দ্রকিশোরের ভাইরা, ছেলেমেয়েরা বন্ধুবান্ধবরা যে যেখানে ছিলেন সবাই একেবারে যেন সন্দেশ কার্যালয়ে ভেঙে পড়লেন! চাঁদের হাট বসে গেল!
>
> উপেন্দ্রকিশোর : লীলা মজুমদার

'সন্দেশ' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রথম লেখা


PATAKA
Multispeciality Hospital
MORNING OPD
₹200
GDHNOV2013MAG


ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর বই।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত **টুনটুনির বই** (৮ম সংস্করণ)

ছেলেমেয়েদের সুন্দর গল্পের বই।

২৭টি গল্প; ৭০ খানি ছোট ছবি, রঙিন মলাট।

মূল্য ।৹ আনা ভি-পিতে ।৶৹

বঙ্গবাণী বলেন :—পাখী, বিড়াল, শৃগাল প্রভৃতির কথা লইয়া নানা রকম গল্প প্রচলিত আছে। গ্রন্থকার সে গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়া লিখিয়াছেন যে, বালকের তো কথাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও পড়িয়া মহানন্দানুভব করিতে পারিবেন। লিপিমাধুর্য্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একটা সম্পদ। ছাপা, বাঁধা ও ছবিগুলি বেশ সুন্দর।

প্রাপ্তিস্থান :—

সন্দেশ কার্য্যালয়,

৭২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কালিকাতা ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় :—

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী, বি.এ, রচিত কবিতা (বিষয় : সন্দেশ বন্দনা), যদিও শিরোনামহীন।

নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে
'সন্দেশ' এসেছে আজ নব সাজ পরে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসি মুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।

আর ছিল ভিতরে আর একটি কবিতা : 'পাখীর গান', স্বরলিপি-সহ। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর গান ভালবাসতেন, চাইতেন ছোটরাও গান করুক, শিখুক—তাই তিনি স্বরলিপিও দিয়েছেন। লেটার প্রেস-এর যুগে সাধারণ গল্প-উপন্যাস ছাপা আর গানের স্বরলিপি ছাপার মধ্যে যে কারিগরিগত তফাত ছিল, তা ভাবা যায় না। স্বরলিপির জন্য শুধুমাত্র অন্য চিহ্নযুক্ত অক্ষরমালা আলাদা করে কিনে নিতে হত—ব্যয়বহুল অথচ বেশিমাত্রায় ব্যবহৃত হবে না। মুদ্রণশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের পত্রিকা প্রকাশের স্বার্থে সেই ব্যয় বহনেও পিছপা হননি। স্বরলিপির শেষে সম্পাদক 'স্মল পাইকা'-তে লিখছেন :

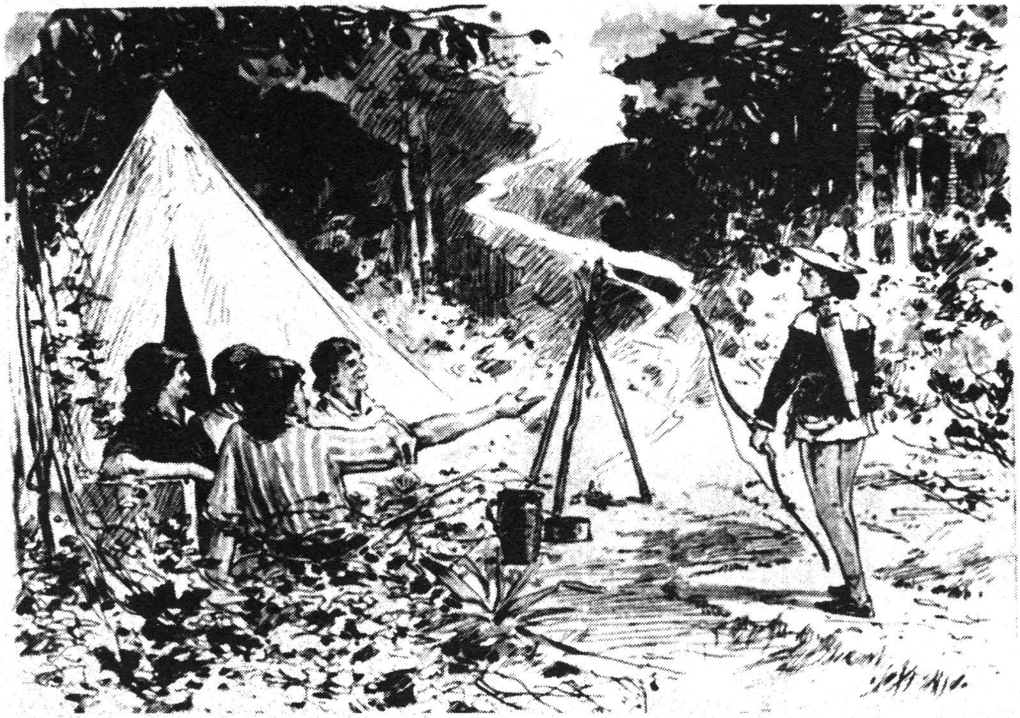
> বালক-বালিকাদের গাহিবার মতন গান আমাদের দেশে বেশী নাই, এজন্য স্কুলে গান শিক্ষা দিবার সময় বড় অসুবিধা হয়। অনেকে এরূপ গান আমাদের নিকট চাহিয়া থাকেন, তাই আমরা মনে করিয়াছি, এরূপ গান মাঝে মাঝে প্রকাশ করিব।
>
> 'সন্দেশ' ১ম বর্ষ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২০, পাতা ২৯



সম্পাদকের ভাবনাই পত্রিকাকে কালজয়ী স্থায়িত্ব প্রদান করে, সম্পাদনার সার্থকতা এখানেই। প্রত্যেক মাসের 'সন্দেশ'-এ একটি ছড়া বা কবিতা থাকত একদম প্রথম পাতায়। আর একটি থাকত ভিতরের পাতায়। এটাই ছিল 'সন্দেশ'-এর House Style। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন বিখ্যাত 'ইলশেগুঁড়ি' ছড়া (ভাদ্র ১৩২০), প্রিয়ম্বদা দেবী লিখছেন 'দুর্দ্দিন' (শ্রাবণ ১৩২০), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীদাস রায়, শ্রীমতী বিজনবালা দাসী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রমথ চৌধুরী, সুখলতা রাও, সুকুমার রায় আরও আরও অনেকেই বিচিত্র সব বিষয়, ছন্দে-কবিতায় ভরিয়ে তুলছেন 'সন্দেশ'-কে।

প্রমদারঞ্জন রায়ের লেখা সত্যি ঘটনা 'বনের খবর' বেরতে শুরু করলে অনেকে তো বিশ্বাসই করে উঠতে পারেনি যে সেই সময় সবই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। সঙ্গে সম্পাদকের আঁকা অসামান্য ছবি—শুধু ছোট কেন বড়দেরও মন জয় করে নিয়েছিল সেসব লেখা।

> আর একজন প্রতিমাসে লিখতেন 'বনের খবর' ছদ্মনাম দিয়ে, তাতে থাকত U.R এর ছবি। কী ভালই যে লাগত। লুসাই পাহাড়ের কাছে বেণী চাকরের লোটা ফেলে ছুট দেওয়া, বালটির জলে ঘটিসুদ্ধ বরফ হয়ে জমে



কুলদারঞ্জন রায় অনূদিত রবিন হুডের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র ঘোষের অলংকরণ

যাওয়া, হাতীর বাচ্চার শুঁড় ধরে টানাটানি—U.R এর সেসব ছবির কথা এখনও মনে পড়ে, তার সঙ্গে লেখারই কি অপূর্ব ভঙ্গী আমরা উপভোগ করেছি।'

—জীবন খাতার কয়েক পাতা : সুনির্মল বসু

বিদেশি সাহিত্যের স্বাদ থেকেই-বা ছোটরা বাদ যায় কেন? সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর তাও ভেবে ফেললেন। কে এ কাজ করতে পারে, কে অনুবাদে ছোটদের মন জয় করে নিতে পারে—তাঁকেও খুঁজে বার করলেন উপেন্দ্রকিশোর অসামান্য সম্পাদকীয় দক্ষতায়।

বাবার কাছে একটা মোটা ইংরাজী বই ছিল—'রবিন হুড'। কুলদাবাবু একদিন বইটার অনুবাদ করবেন বলে চেয়ে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরেই সন্দেশে কুলদাবাবুর লেখা রহিন-হুড্ মাসে মাসে বের হতে লাগল, সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী পি. ঘোষের আঁকা একরঙা ছবি।
একটা ছবির কথা মনে আছে। রহিন হুডের তীর ছোঁড়া দেখে কে একজন তারিফ করে বলছে—'কেয়া তোফা বাচ্চা তীরন্দাজ রে।'

—জীবন খাতার কয়েক পাতা : সুনির্মল বসু

অনুবাদক কুলদারঞ্জন রায়কে উপেন্দ্রকিশোর ব্যবহার করলেন শিশুদের কাছে বিশ্বসাহিত্যের মজা অনুভব করানোর জন্য—সচিত্রভাবে।

৪

শুধু কি ছোটদের আনন্দ ও শিক্ষাদান—এ নিয়েই ছিল 'সন্দেশ'? প্রকৃতপক্ষে তাই—অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, সহজ-সরল ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল—যার নাম 'শিশু'—যেখানে শিশুদের কথা বলার ধরন, উচ্চারণের ভঙ্গিমা, আধোবুলির সাংকেতিক মানে নিয়ে লিখছেন স্বয়ং সম্পাদকমশাই—অথচ ভাবা যায়, সে-সময় তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর! এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কি আদতে শিশুদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে রচিত নয়?

'খোকার নাম 'সুকুমার'; সে কথা তাহার মুখে আসে না, সে বলে 'কুতুমাম'। চাকর লছমনকে সে বলে 'বুথুমাম'; রামভজনের নাম রাখিয়াছে 'ভজাজ্জা'। অনেক সময় অক্ষর মুখে আসিলেও কোনটা আগে কোনটা পরে ঠিক থাকে না। তখন 'টুপি' হয় 'পুটি', 'বেগুন' হয় 'গেবুন', 'লবন' ও 'বদন', 'চাবি' হয় 'পাখি'।

—শিশু : সন্দেশ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩২০

প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে কীভাবে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তবে এই 'ভোকাবুলারি'-কে তাদের জন্য পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করা যায়—তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! আবার 'সন্দেশ' ২য় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশ হচ্ছে 'লেখার কথা' প্রবন্ধ, যেখানে অক্ষর কীভাবে আসে, হরফ কীরকম ছিল তা সরল করে বোঝাচ্ছেন—এ শুধু শিশুমনের উদ্দেশ্যে না কি অভিভাবকদেরও শিক্ষিত করার জন্য? সম্পাদকের চিন্তাধারা কত উচ্চমানের হতে পারে তা প্রায় তিন বছরের 'সন্দেশ' সম্পাদনার মাধ্যমে উপেন্দ্রকিশোর বুঝিয়ে দিয়েছেন—

যাহা হউক আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে—অর্থাৎ সন্দেশ পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।

—সন্দেশের কথা, সন্দেশ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩২০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি : —

● সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধদেব বসু, সিগনেট, ১৩৬১
● জীবন খাতার কয়েক পাতা, সুনির্মল বসু, ওরিয়েন্ট, ১৩৯০
● ছেলেবেলার দিনগুলি, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৩৮৮
● উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৩৮৯
● উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হেমন্তকুমার আঢ্য, সাহিত্য একাদেমী ১৯৯৭
● উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প, হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ফার্মা কেএলএম, ১৩৯০
● টুনটুনির বই, সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ২০০২
● সন্দেশ ১ম/২য়/৩য় বছর, পারুল প্রকাশনী, ১৪১৫, ২০১০, ২০১২।

সন্দেশ



ছেলেমেয়েদের জন্য

সচিত্র মাসিক পত্র

সন্দেশের কথা।

একটি বাঙ্গালিবাবু এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন; তাঁহার একটী খোট্টা চাকর ছিল। চাকরটি সবে পাড়া গাঁ হইতে আসিয়াছে, সহরের চাল চলন এখনও ভাল করিয়া শিখে নাই; আর বাঙ্গালির রীতি নীতি কিছুই জানে না।

বাবু তাহাকে বলিলেন, "দেখ, ছ' আনার সন্দেশ কিনিয়া আনত।" চাকরটি ছ আনার পয়সা লইয়া সন্দেশ কিনিতে বাহির হইল, আর ভাবিল সে কি বিপদেই পড়িয়াছে। "সন্দেশ" বলিলে তাহার দেশের লোকে বুঝে 'সংবাদ'; সে জিনিস যে আবার কি করিয়া পয়সা দিয়া কিনিতে পারা যায়, আর গেলেও তাহা যে কোথায় মিলে, তাহা সে কোন্ মতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কাজেই বেচারা আর কি করে? সে পয়সা ক'টি হাতে লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যে আসে তাহাকেই বিনয় করিয়া বলে, "এ ভাইয়া! দো আনাকা সন্দেশ কাঁহা মিলি?"

একথা যে শোনে সেই হাসে। শেষে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, 'সন্দেশ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয়; বাঙ্গালিবাবুরা একরকমের লাড্ডু খায় তাহারই নাম 'সন্দেশ'। ময়রার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।'

তখন সে ভারি খুসী হইয়া ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিল, আর মনে করিল খুব একটা কাজ করিয়াছে।

চাকর বেচারা লাড্ডুকে খবর ভাবিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিল। আমরাও যদি লাড্ডু বলিতে খবর বুঝিয়া লই, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খবরকে যদি লাড্ডু মনে করা যায় তবে সেটা বোধহয় তেমন দোষের কথা হয় না।

লাড্ডু খাইবার জিনিস। সে জিনিস ভাল হইলে মিষ্টও লাগে বলও বাড়ে। ভাল বস্তু খাইয়া যেমন শরীরে বল হয়, তেমনি ভাল কথা জানিয়া মনে বল হয়; উহাই মনের আহার। তাহা যদি মিষ্ট হয়, তবে তাহাকে মনের লাড্ডু বলিতে দোষ কি?

'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি, সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ঐ শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ' সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদের' অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই আশ্চর্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে। আজ কাল যেমন 'তত্ত্ব' পাঠান হয়, তেমনি আগে হয়ত লোকে 'সন্দেশ' পাঠাইত। তত্ত্ব, কিনা, কুশল মঙ্গলের সংবাদ, সেইটিই আসল কথা; সঙ্গের মিষ্টান্ন এবং উপহার স্নেহের চিহ্নমাত্র। কথা এই বটে, কিন্তু কাজে এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল মিঠাই সন্দেশ; আসল খবরের কথা চাপা পড়িয়াছে। সে খবর না থাকিলেও কেহ কিছু মনে করে না, কিন্তু মিঠাই না থাকিলে হয়ত চটে। 'সন্দেশে'র বেলায় ও বোধ হয় এমনিতর একটা কিছু হইয়াছিল; আর 'তত্ত্বের'ও হয়ত কালে 'সন্দেশে'র দশা হইয়া উহা ময়রার দোকানে সের হিসাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।



প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩২০। প্রথম সংখ্যা।

নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,
'সন্দেশ' এসেছে আজ নব সাজ প'রে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসি মুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।
সরল হৃদয় তার, মধুর বচন,
শুনিব তাহার মুখে সন্দেশ নূতন।
বিভুর আশীষ বাণী তাহার মাথায়,
চাহিয়া লইব সবে, আয় তবে আয়।
এ নব সন্দেশ যেন বরষ বরষ,
জাগায় নবীন আশা, নূতন হরষ।
শুনায় নূতন বাণী, আনে নব কাজ,
কল্যাণে পুলকে ভরা,—এই চাহি আজ।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বি, এ।

প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য।

তমসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। দু'ধারে গভীর বন; তাহার মাঝখান দিয়া সুন্দর ছোট নদীটি কুল কুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিস্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটুও কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাচের মত চলমল করিতেছে। বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেই নির্ম্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই সুখ হইল। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কি নির্ম্মল, যেমন সাধু লোকের মন। আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব।"

সেইখানে দুটী বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর দুটী পাখী, এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহারা মনের আনন্দে এমনি চমৎকার খেলা করিতেছিল যে, দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখী দুটীর উপরে মুনির কেমন স্নেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই



শিল্পী : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক দুষ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখী দুটীর পানে তীর ছুঁড়িয়া মারিল। এমনি সুখে পাখী দুটী খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোন দোষ ছিল না, কোন বিপদের কথা তাহারা জানিত না; এমন নিরীহ জীবকে বধ করে এমন নিষ্ঠুরও লোক হয়? তীর খাইয়া পুরুষ পাখীটি যাতনায় ছটফট্ করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল। মুনি আর এ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন, "ওরে ব্যাধ, এমন সুখে পাখীটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করলি? তোর কখনই ভাল হইবে না!"

দয়ালু মুনির মনের দুঃখ তাঁহার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলির ভিতর

দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া আপনা হইতেই তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্ব্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "একি চমৎকার কথা আমি বলিলাম! আমি কিছুই জানিনা, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মতন কেমন সুন্দর ছন্দ হইল! ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল! আমি বলি ইহার নাম 'শ্লোক' হউক, কেননা আমার শোকের সময় ইহা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।"

ভরদ্বাজও বলিলেন,"গুরুদেব! কি সুন্দর কথা, এমন কথা ত আর কেহ কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।"

তারপর মুনি স্নান শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সেই পাখীর আর সেই সুন্দর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখী দুইটীর দুঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্য কথা বলিবার অবসর পাইলেন না তাঁহাকে সেই দুষ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনী তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটী কথা মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্ব্বত আর নদী সকল থাকিবে, ততদি লোকে তোমার 'রামায়ণের' আদর করিবে; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকি তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মী বলিলেন, "এইরূপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।"

তারপর সেই ধার্ম্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া যোড় হাতে ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্ব রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মু ভাবিলেন, "কাব্য ত শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে?" ঠিক এই সময়ে 'কু 'লব' দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দুটি ভাই রামেরই পু মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখা পড়া শিখেন। দেবতার মতন সুন্দর গন্ধর্ব্বের মতন মিষ্ট গান গাহেন। মুনি বলিলেন, "এই আমার রামায়ণে উপযুক্ত গায়ক।"

সেই দুটি ভাইকে পরম যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। তা পর একদিন সকল মুনিদিগকে সভায় ডাকিয়া সেই রামায়ণের গান তাহাদিগ শোনান হইল। মুনিরা সকলে মোহিত হইয়া সে গান শুনিলেন, তাঁহাদের চো দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল 'আহা 'আহা!' এই শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা আর স্থির থাকি পারিলেন না। একজন মুনি তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল, সকলই কুশীলব দিয়া দিলেন। অন্যেরাও কেহ বল্কল, কেহ হরিণের ছাল, কেহ কমণ্ডলু, কে কুড়াল কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি কাঠ আনিতে চলিয়াছিলেন, সে কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছি ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না; তিনি সে দড়িগাছিই কুশীলবকে দিয়া বার বার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

——*——

কথাবার্ত্তা।

ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মঙ্গল হউক। আমরা যেন যথার্থ বন্ধুর মতন তাঁহাদের সেবা করিতে পারি।

তাঁহাদের অনেককেই আমরা কখনও চক্ষে দেখি নাই, তাঁহাদেরও অনেকে কখনও আমাদিগকে দেখেন নাই। আশা করি, ক্রমে আমাদের পরিচয় হইবে, আর শেষে বন্ধুতাও হইবে। 'সন্দেশ' এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইলে হয়ত অতি সহজেই বন্ধুতা হইতে পারিত। কিন্তু এ 'সন্দেশ'কেও চেষ্টা করিলে ঐরূপ, কিম্বা ততোধিক মিষ্ট করা যায়। তবে এ বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য চাই।

তোমাদের কাহার কোন বিষয়ের চর্চ্চা ভাল লাগে, আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে। আমরা যথাসাধ্য সেই চর্চ্চায় যোগ দিতে চেষ্টা করিব। বিদ্যালয়ের পড়া শিখান শিক্ষক মহাশয়দের কাজ, নীতিশিক্ষা দেওয়া গুরুজনের কাজ; আমাদের সে সকল বিষয়ে হাত দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়াও অনেক উপকার এবং শিক্ষার উপায় আছে, আমাদের খেলা দিয়াও আমরা শরীর মনের উন্নতি করিতে পারি। এই সকল বিষয়ে যথাসাধ্য তোমাদের সহায়তা করিতে পারিলে আমরা বড়ই সুখী হইব।

বিশেষতঃ ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলা ও শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চায় কোনরূপ পরামর্শের প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে লিখিতে ভুলিও না। আমাদের খুব ভরসা আছে যে এ সকল বিষয়ে আমরা বেশ ভাল পরামর্শ দিতে পারিব। আর যারপরনাই আনন্দের সহিতই সেই পরামর্শ দিব। পত্রের পৃথক উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। তোমাদের অভাব জানিতে পারিলে "সন্দেশে"ই তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিব। ইহাতে অন্যেরও উপকার হইবে, পত্র লেখকেরও উপকার হইবে। যে সকল বিষয়ের নাম করা হইল, তদ্ভিন্ন তোমাদের প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে কোন সংবাদ জানিবার আবশ্যক হইলেও আমাদিগকে লিখিবে, আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।



'পৃথিবীর পিতা' নামের পৌরাণিক আখ্যায়িকার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এই অলংকরণটি ব্যবহৃত হয়েছিল

পাখীর গান

কত পাখী আছে, তাহা কহ মোর কাছে।
আহা, কত মত সাজে তারা ফেরে ধরা মাঝে॥
তারা বলে কত বুলি, তারা করে কত খেলা,
দুখ নাহি কা'রো মনে, কা'রো কাজে নাহি হেলা॥
নাচে খঞ্জন বাটে মাঠে, আর কোকিল গাহে ডালে,
আর কিবা মনে করে কাক বসে আসি চালে!
মুনি ঠাকুরেরি মত বক থাকে ঝিম ধরে,
মাছ এলে মুখ মেলে তারে গেলে কপ্ করে॥
কহে হুতোমেরে প্যাঁচা, 'মুই বলি শোন চাচা'
এই যে হাঁড়ি মুখে দাড়ি, এর বাহার বড় ভারি!'
শামা বুল্‌বুল্ গাহে বনে, মিলি দয়েলের সনে,
এসে চড়াই ঘরে বড়াই করে শঙ্কা নাহি মনে॥
বল শঙ্খচিল কেন যত ঘটি বাটি পাবে
আর গোদা বেটা কেন খালি ঘাড়ে লাথি খাবে?
কহ সে বা কোন পাখী যার বৌ না কহে কথা?
কিবা নামটি তার চোখে যার বড্ড হায় ব্যথা?
বটে চালাক বড় শালিক, রাখে দুনিয়ার খবর,
আর ময়না কাকাতুয়া তারা কথায় বড় জব্বর।
তার গলে দোলে ঝোল্লা, গায়ে কালো আলখাল্লা,
রূপের কিবা হয় জিল্লা হাই তুলে হাড়গিল্লা!
আছে গগনবেড়, গৃধিনী, শাঁচানি, শকুনি,
পায়রা, ঘুঘু, ফিঙ্গা, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা,
কাঠঠোক্‌রা, কাদাখোঁচা, হরবোলা, হাঁড়িচাচা,
টিয়া, টুনটুনি, টিঠী পাখী,—কহ কত আর বাকী।

	+	০	+	০
পা পা	পা -া গা	-া পা ধা	ধা র্সা র্সা	-া র্সা র্সা
মু নি	ঠা ॰ কু	॰ রে রি	ম ॰ ত	॰ ব ক্
ক হ	সে ॰ বা	॰ কো ন্	পা ॰ খী	॰ যা র্
শ্যা মা	বু ল্ বু	ল্ গা হে-	ব ॰ নে	॰ মি লি
তা র্	গ ॰ লে	॰ দো লে	ঝো ॰ ল্লা	॰ গা য়ে

+	০	+	০
র্সা -র্রা র্রা	-া র্রা র্গা	র্গা -র্রা র্সা	-া না ধা
থা ॰ কে	॰ ঝি- ম্	ধ ॰ রে	॰ মা ছ
বৌ ॰ না	॰ ক য়	ক ॰ থা	॰ কি বা
দ ॰ য়ে	॰ লে র্	স ॰ নে	॰ এ সে
কা ॰ লো	॰ আ ল্	খা ॰ ল্লা	॰ রূ পের্

সংবাদ

আমেরিকার পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশে একটি তের বৎসরের ছেলে ইহারই মধ্যে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠিয়াছে। আর এখনও সে এত তাড়াতাড়ি বাড়িতেছে যে তাহার কাপড় চোপড় লইয়া তাহার বাপ মা বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছেন। কাপড় পুরাণো হইবার আগেই তাহা ছোট হইয়া যায়। সে ওজনে আড়াই মণ, আর সাধারণ লোকের খাটে শুইতে গেলে তাহার পা বাহির হইয়া পড়ে। এই হিসাবে বাড়িয়া চলিলে বোধ হয় বড় হইলে আর ইহার খেয়ার পয়সা লাগিবে না। সে হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিবে।

গত বৎসর একটি কুকুর বড়ই সাহস করিয়া তাহার প্রভুকে খ্যাপা ষাঁড়ের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিল। লোকটি কুকুরটাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছেন এমন সময়ে এক ষাঁড় ক্ষেপিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে এমনি ভয়ঙ্কর গুঁতা মারিল যে সেই গুঁতায় তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি একবারে শূন্যে উঠিয়া গেলেন। তাহাতে আধমরা হইয়া যেই তিনি মাটিতে পড়িয়াছেন, অমনি ষাঁড়টা শিং বাগাইয়া আবার তাঁহাকে গুঁতাইতে আসিল। কিন্তু গুঁতা আর তাহাকে মারিতে হইল না। তাহার আগেই কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার নাকে এমনি বিষম কামড়াইয়া ধরিল যে কামড়ান যাকে বলে। ষাঁড় তখন কুকুর ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজের নাক রাখিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে যে-সে কুকুর ছিল না, বুল্‌ডগ্,—একবার কামড়াইয়া ধরিলে আর প্রাণ থাকিতে সে কামড় ছাড়িতে জানে না। ষাঁড় যতই তাহাকে ঝাড়ে আর আছড়ায়, ততই সে আরো মজবুত করিয়া কামড়াইয়া ধরে। ততক্ষণে অন্য কয়েক জন লোক আসিয়া তাহার প্রভুকে সেখান হইতে সরাইয়া নিল। তাহারা সেই লোকটিকে একটা ভাল জায়গায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে ষাঁড়টা কুকুরের ভয়ে জলে নামিয়া যারপর নাই জড়সড় ভাবে, খালি মাথাটি জাগাইয়া রহিয়াছে। কুকুরটা ডাঙ্গায় পড়িয়া আছে, তাহার চুয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চুয়াল না ভাঙ্গিলে সে ষাঁড় মহাশয়কে কিছুতেই ছাড়িত না।

কুকুর আর তাহার প্রভু কিছুদিনের চিকিৎসায় ভাল হইয়া গেল। কিন্তু ষাঁড়ের নাকের আর গলার এমনি দশা হইয়াছিল যে তাহাকে গুলি করিরা মারা ভিন্ন আর উপায় রহিল না।

সয়ার আর স্মিথ নামে দুজন সাহেব গত ২৯এ মার্চ্চ ভোরে ৪টা ১০ মিনিটের সময় বোম্বাই হইতে মোটর গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া ১লা এপ্রিল, বেলা ১১½টার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ নয় দশ দিনের কমে মোটর গাড়ীতে বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিতে পারে নাই।

সয়ার আর স্মিথ সাহেব, কেবলমাত্র কানপুরে একবার পেট ভরিয়া খাইয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন টিনের দুধ আর চা ছাড়া আর কিছু খান নাই। কানপুরে দুটি ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইয়া ছিলেন, তাহা ছাড়া আর নিদ্রাও যান নাই। পথে সাতবার তাঁহাদের 'টায়ার' ফুটা হইয়াছিল, কয়েকটা 'টায়ার' বদলাইতে ও হইয়াছিল।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ ১৩২০) নির্বাচিত প্রতিলিপি সংস্করণ।
কৃতজ্ঞতা : সন্দীপ রায় ও সৌম্যেন পাল

যাহা বাহান্ন তাহাই সত্য

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'সন্দেশ' প্রকাশ করেছিলেন যে-বছর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পান। আর সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৬১ সালে, সেই বছরটা রবীন্দ্রজন্মের শতবর্ষ। সম্পাদক হিসেবে তিনি নিজে কলম ধরেছিলেন তো বটেই, সেই সঙ্গে তুলে এনেছিলেন একঝাঁক প্রতিভা, যাঁরা ছোটদের মনের ভাবকে রঙে-রেখায়-লেখায় তুলে ধরতে পারঙ্গম।

একদিন সকালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে আড্ডা মারতে। তখন শীতকাল। দুই বন্ধু মিলে একথা-সেকথা বলতে-বলতে হঠাৎ উঠল 'সন্দেশ' পত্রিকার কথা। "সন্দেশ' নতুন করে বের করলে কেমন হয়?" দুই বন্ধুই সমান উৎসাহিত!

সেই বছরটাই ছিল সাংস্কৃতিক উদ্দীপনায় ভরপুর। রবীন্দ্রজন্মের শতবর্ষ। ১৯৬১। রবীন্দ্রনাথ যে-বছর নোবেল পেলেন, সে-বছরই প্রথম 'সন্দেশ' বের করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাই নতুন করে 'সন্দেশ' প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের চেয়ে উপযুক্ত বছর আর কী হতে পারে?

'সন্দেশ' আবার প্রকাশিত হোক, এটা সবচেয়ে বেশি চেয়েছিলেন সত্যজিতের মা সুপ্রভা রায়। তিনি জানতেন, সত্যজিতের বাবা আর ঠাকুর্দার প্রতি সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব এভাবেই। মায়ের স্বপ্ন পূর্ণ করতে প্রবল উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন সত্যজিৎ রায়। তিনিই হবেন সম্পাদক। যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু একটাই মুশকিল। 'সন্দেশ' প্রতি মাসে প্রকাশ করতেই হবে। তাই নিয়মিত টাকার জোগান চাই। কোথা থেকে আসবে সেই টাকা?

সেই সমস্যার সমাধান করলেন সত্যজিৎ রায়। কীভাবে? তখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। তৈরি করছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ঘণ্টার তথ্যচিত্র। সঙ্গে পরিচালনা করছেন 'তিন কন্যা'। সুতরাং, নিজের উপার্জন থেকেই 'সন্দেশ'-এর প্রথম পাঁচ-ছ'টা সংখ্যা ছাপার খরচ দিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি কার্পণ্য করেননি। কারণ, শুরু থেকেই 'সন্দেশ'-এর ছাপা আর বাঁধাইয়ের কাজ খুবই উঁচু মানের। অল্প-চকচকে কোমল ঘি রঙের কাগজে 'সন্দেশ' ছাপা হতে শুরু করল। সেই কাগজের দামও অনেক। তা ছাড়া পাতায়-পাতায় দুর্দান্ত ছবি আঁকতেন সত্যজিৎ নিজেই। ছবিগুলোর ব্লক তৈরি করার খরচও কম নয়। প্রথম ছ'-সাত মাস এই সব কিছুর খরচ একাই জুগিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। তবে একটাই বাঁচোয়া। প্রথম শারদীয়া সংখ্যায় প্রচুর বিজ্ঞাপন পেয়েছিল 'সন্দেশ'। বিজ্ঞাপনের টাকা আসতে শুরু করেছিল কালীপুজোর পর থেকেই। সুতরাং, ১৯৬১-র নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই 'সন্দেশ' যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, একথা বলা যায়।

প্রথম বছরেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল 'সন্দেশ'। কিন্তু কী এমন ছিল 'সন্দেশ'-এ, যা একেবারেই নতুন? এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের লেখার কথা। প্রথম বছরেই তিনি ল্যুইস ক্যারোল-এর দীর্ঘ কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। নাম—'জবরখাকি'!! (মূল নাম—'জ্যাবারওয়াকি')। এমন আশ্চর্য-অদ্ভুত কবিতা বাংলা ভাষায় কেউ আগে পড়েনি। কবিতাটা কেন অদ্ভুত, সেটা এই প্রবন্ধের ছোট্ট জায়গায় বোঝানো যাবে না। সত্যজিৎ রায়ের 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' বইতে কবিতাটি আছে। যাঁরা পড়েননি, পড়ে নিতে পারেন। এডওয়ার্ড লিয়ার-এর দীর্ঘ কবিতা অবলম্বনে সত্যজিৎ নতুন কবিতা লিখলেন 'পাপাঙ্গুল'। এই কবিতার আশ্চর্য ছন্দ আর ভাষা ছেলে-বুড়ো সবারই মনে দোলা লাগল। এভাবেই এডওয়ার্ড লিয়ার চলে এলেন বাংলা ভাষার আঙিনায়। নতুন 'সন্দেশ' বেরনোর আগে ইংরেজ কবি লিয়ার-এ নামও প্রায় শোনেনি বাংলার ছোটরা।

তারপর, শারদীয়া সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক বেরতে শুরু করল প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম উপন্যাস। সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের জোরালো তুলিতে আঁকা জীবন্ত সব ছবি। নন্দলাল বসু আর রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এর পরে, ছবি আর লেখার এমন যুগলবন্দি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আগে আর হয়নি। এই যুগলবন্দি জীবিত ছিল টানা ত্রিশ বছর। সত্যজিতের আঁকা আর লীলা মজুমদারের লেখার এমন যুগলবন্দি এত দিন ধরে ঘটতই না, যদি না 'সন্দেশ' নতুন করে বেরত ১৯৬১ থেকে।

শুধু ওঁরা দু'জনই নন, নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রথম দু'বছরে লিখলেন শিবরাম চক্রবর্তী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে—কাকে ছেড়ে কার কথা বলি? সবাই তাঁদের কলম-ধরা-হাত বাড়িয়ে দিলেন 'সন্দেশ'-এর দিকে।

'সন্দেশ'-এ উদ্ভট রসের গল্প লিখে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন সুবিমল রায়। ইনি সুকুমার রায়ের সবচেয়ে ছোট ভাই। অকৃতদার এই মানুষটার রক্তেই মিশে ছিল খেয়াল রস। তাঁর গল্প 'ব্রহ্মনারায়ণ খাঁ' বা 'সদানন্দ স্বদেশলাল' কে ভুলতে পারে? সুবিমল রায় 'সন্দেশ' ছাড়া অন্য কোথাও লেখেননি।

অদ্ভুত রসের গল্প লিখে সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন এক নতুন লেখিকা—শিবানী রায়চৌধুরী। সব সময় তিনি ছোট্ট একটা দুষ্টু ছেলের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প লিখতেন। নিজেই ছবি আঁকতেন নিজের গল্পের সঙ্গে। আজগুবি নাম দিতেন গল্পের—'গজাননের স্বপ্ন', 'ইন্তাবিলের পুঁথি' ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে বিরল এই উদ্ভট গল্পগুলো 'সন্দেশ' ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশিত হওয়ার কথা ভাবাই যেত না।

দ্বিতীয় বছর ১৯৬২ থেকে 'সন্দেশ'-এ ছোটগল্প লিখতে শুরু করলেন সত্যজিৎ রায়। প্রথম গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত গল্পটি সম্পর্কে এখানে কিছুই বলছি না। কারণ, গল্পটা সবাই জানেন। তারপর থেকে আজীবন 'সন্দেশ'-এর জন্য সত্যজিতের কলম আর থামেনি। আজ আর বলে



দেওয়ার দরকার নেই যে, সত্যজিৎ রায়ের লেখাই ছিল প্রথম ত্রিশ বছরে 'সন্দেশ'-এর প্রধান আকর্ষণ।

'সন্দেশ'-এর ঐতিহাসিক অবদান

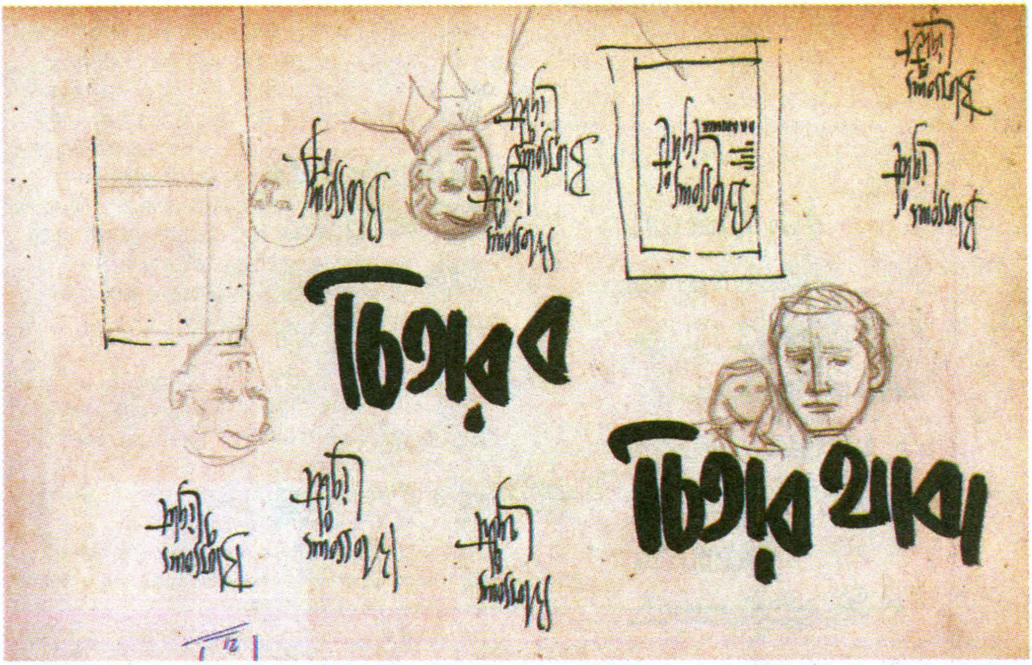
দ্বিতীয় বছর থেকে এমন একটা নতুন বিভাগ শুরু হল 'সন্দেশ'-এর পাতায়, যার কথা কেউ কখনও ভাবেনি। বিভাগের নতুন—'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। লেখক জীবন সর্দার। অবশ্যই এটা ছদ্মনাম। রবীন্দ্রনাথের নাটক 'ফাল্গুনী' থেকে নামটা বেছে দিয়েছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কী ছিল এই বিভাগে? ছিল নতুন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার প্রকৃতিকে দেখা। এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? নতুনত্বটা এইখানেই যে, এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রকৃতিকে নিয়ে যা-যা লেখা হত ছোটদের পত্রিকায়, তার প্রায় সবই ছিল বই পড়ে লেখা। এমনকী সুকুমার রায়ও যখন 'সন্দেশ'-এ প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন বই পড়েই লিখেছেন—সেই লেখা যতই সরস হোক না কেন। কিন্তু নতুন 'সন্দেশ'-এর 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এ সম্পূর্ণ উল্টো পথে হাঁটলেন জীবন সর্দার। নিজে তিনি মাঠে-বনে-নদীতে ঘুরে বেড়াতেন, আর প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতেন। আর যা দেখতেন, তা-ই লিখে রাখতেন ছোট্ট-ছোট্ট খাতায়। এই খাতার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'মেঠো খসড়া'। এই 'মেঠো খসড়া' থেকেই দেড়-দু'পাতার ছোট-ছোট লেখা তৈরি করতেন জীবন সর্দার। সেই সব লেখাই ছাপা হত নতুন 'সন্দেশ'-এর 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এ। যে-প্রাণীকে জীবন সর্দার নিজের চোখে দেখেননি, যে-পাখির গান নিজের কানে শোনেননি—তাদের কথা কখনও লেখেননি 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এ। তাই এই বিভাগে কখনও ডাইনোসর নিয়ে কোনও লেখা বেরয়নি। ডাইনোসর-এর বদলে এল ছোটপুকুরের পোকাদের কথা, মেঠো শেয়ালের কথা, ঝরা পাতার কথা। খুব কাছের প্রকৃতিরও নানা অজানা দিক জীবন সর্দার তুলে ধরতে লাগলেন তাঁর এই বিভাগে। 'সন্দেশ'-এর খুদে পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারল, তারা নিজেরাই খুব সহজে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে পারে। তার জন্য তুষারাবৃত পর্বতে বা ধুলিঝড়-ওঠা মরুভূমিতে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। শুধু ঘাস দেখলেও চলবে। মনে আছে, আমি যখন 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এ নাম লেখালাম, জীবন সর্দার 'ছোট্ট' একটা কাজ দিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, 'তোমার বাড়ির সামনে কতরকমের ঘাস গজায়—তা দেখে-দেখে লিখে রাখো।' খুঁটিয়ে দেখেছিলাম—মোট তিনরকমের ঘাস গজায় বাড়ির আঙিনায়। ঘাস নিয়ে আমার সেই লেখাটা 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এ ছাপাও হয়েছিল। নিজেই বুঝেছিলাম, মাটির ওপর ঝুঁকে ঘাস দেখার মধ্যে ফুটবল খেলার চেয়েও বেশি আনন্দ পাওয়া সম্ভব। নতুন 'সন্দেশ' না-বেরলে এই উপলব্ধি আমার কোনও দিনই হত না। শুধু তো আমার একার নয়—এই উপলব্ধি হয়েছিল আরও অনেক ছেলেমেয়ের। এর ফলটা হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কাছের প্রকৃতিকে আপন করে নিতে শিখল একটা গোটা প্রজন্ম। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন উপলব্ধি করল। জীবন সর্দার পরিবেশ-আন্দোলনের অগ্রদূত। নতুন 'সন্দেশ'-এর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক অবদান এটাই। (তিনি অবশ্য আজও একইভাবে লিখে চলেছেন। এ বছরের শারদীয়া 'সন্দেশ'-এও আছে জীবন সর্দার-এর লেখা।)

আবার আর্থিক সংকট

দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে আবার বিরাট আর্থিক সংকটে পড়ল 'সন্দেশ'। সম্পাদকরা দেখলেন কিছুতেই 'সন্দেশ'-কে নিজের পায়ে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। শুরু থেকেই 'সন্দেশ' লেখালেখি, ছবি আঁকা আর ছাপার দিক থেকে যে অত্যুচ্চ মান ছুঁয়েছিল, তা বজায় রাখতে গেলে যে-খরচটা প্রতি মাসে করতেই হয়, সেটা করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তার ওপর যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ 'সন্দেশ'-এর কাজ ছেড়ে দিলেন। প্রথম দু'বছর 'সন্দেশ'-এর আপিস ছিল ধর্মতলায়। সেই আপিসও উঠে গেল। কিন্তু তবুও 'সন্দেশ' বেঁচে রইল। ধর্মতলার আপিস থেকে 'সন্দেশ'-কে প্রায় কোলে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন নলিনী দাশ। তিনি সত্যজিৎ রায়ের আপন পিসতুতো দিদি। তৃতীয় বছর, মানে ১৯৬৩ সাল থেকে 'সন্দেশ'-এর নতুন আপিস হল নলিনী দাশের বাড়ির বৈঠকখানায়—রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় নতুন যুগ্ম সম্পাদক হলেন লীলা মজুমদার। 'দিন-দুপুরে' বা 'পদীপিসির বর্মী বাক্স'-র মতো বই লিখে তত দিনে তিনি ছোট পাঠক-পাঠিকাদের মনের রানি। সুতরাং, তৃতীয় বছরে পা দিয়ে 'সন্দেশ'-এর শক্তি যেন আরও বেড়ে গেল।

এই তৃতীয় বছরটা আরও একটা দিক থেকে অবিস্মরণীয়।





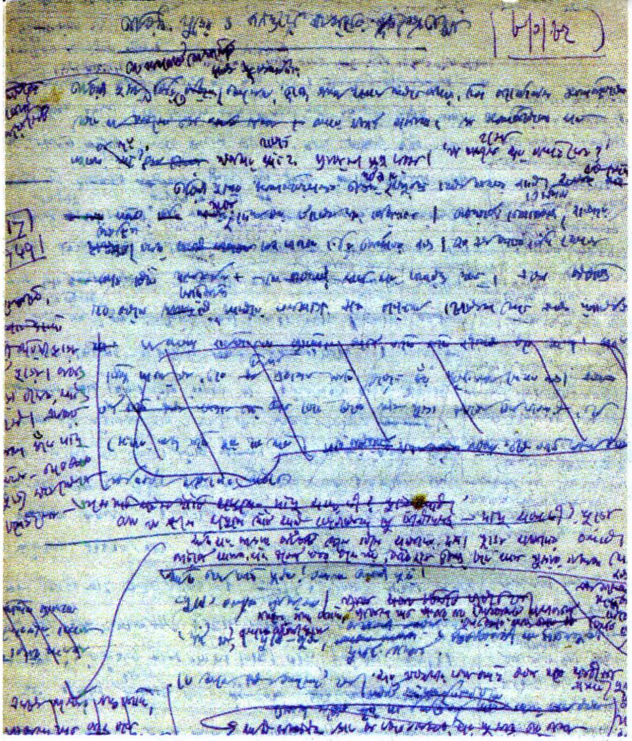
কারণ, সেটা ছিল, 'সন্দেশ'-এর মূল প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবার্ষিকী। তাই পাঠকরা আশা করেছিলেন, সেই বছরটায় 'সন্দেশ' নিজের মান বজায় রাখবে। হলও তাই। বেরতে শুরু করল প্রিয়ম্বদা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পঞ্চুলাল'। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর লীলা মজুমদার যুগ্মভাবে লিখতে লাগলেন একটা উপন্যাস—'হট্টমেলার দেশে'। একই সঙ্গে সত্যজিৎ রায় লিখলেন মন-মাতানো-প্রাণ-কাঁপানো গল্প—'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়', 'শিবু আর রাক্ষসের কথা', 'বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম'...। শুধুই লেখা নয়, 'সন্দেশ'-এর পাতার-পর-পাতা সত্যজিৎ ভরে দিতে লাগলেন বিচিত্র সব ছবি এঁকে। তার মধ্যে রঙিন ছবিও ছিল। আর সেই সব ছবির কত বিচিত্র স্টাইল। কোনওটা চাইনিজ ইঙ্কে ডোবানো ক্রোক্যুইল নিব-এর দ্রুত সরু আঁচড়ে আঁকা, কোনওটা মোটা তুলির টানে, আবার কোনও ছবি দেখে মনে হয় যেন কাঠ-খোদাই। নানান জাতের এত ছবি এর আগে কোনও বাঙালি শিল্পী আঁকতে পারেননি। পরেও না। সত্যজিতের সঙ্গে ছবি আঁকায় কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন প্রসাদ রায় ওরফে ময়ূখ চৌধুরী। আফ্রিকার জঙ্গলের পটভূমিতে তিনি কমিক্স করলেন। বন্যপ্রাণী আঁকার কাজে তাঁর কোনও জুড়ি ছিল না। তরতর করে এগিয়ে চলল 'সন্দেশ'। এইভাবে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর নতুন আপিসে চমৎকার কেটে গেল ছ'টা বছর—১৯৬৯ পর্যন্ত।

এই সময় প্রতিভাময়ী এক লেখিকার জন্ম হল 'সন্দেশ'-এর পাতায়। তাঁর নাম গৌরী ধর্মপাল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। 'সন্দেশ'-এ তিনি ধারাবাহিক ভাবে লিখতে লাগলেন পঞ্চতন্ত্রের গল্প। তাঁর কলমের মিষ্টত্ব 'সন্দেশ'-এর সেই সময়ের কোনও পাঠক আজও ভোলেননি।

এই পর্বে—১৯৬৩ থেকে '৬৯—'সন্দেশ'-এর সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ফেলুদা'র আবির্ভাব। ১৯৬৫-তে সত্যজিৎ লিখলেন 'ফেলুদা'-কে নিয়ে প্রথম গল্প : 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। লেখক নিজেও ভাবতে পারেননি ফেলুদা এক নিমেষেই এতটা পাঠক-প্রিয় হয়ে উঠবে। সম্পাদকমশাই এত চিঠি পেলেন পাঠকদের কাছ থেকে যে তিনি ফেলুদাকে নিয়ে আরও গল্প লিখতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত লিখলেন ফেলুদাকে নিয়ে একটা উপন্যাস : 'বাদশাহী আংটি'। এই উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে 'সন্দেশ'-এ বেরিয়েছিল ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ সালের মে মাস পর্যন্ত। ছেলেমেয়েরা বলল, এমন রহস্য-উপন্যাস তারা কেউ কখনও পড়েনি। ফলে 'বাদশাহী আংটি'-র পর থেকে 'সন্দেশ'-এর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল।

আরও একটা বলার মতো ঘটনা ঘটল এই ছ'বছরে। সেটা হল, নতুন লেখকদের আবির্ভাব। এই নতুনদের জায়গা দেওয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, কারণ, এই সময় শরদিন্দু ও শিবরাম চক্রবর্তীর মতো 'পেশাদার' লেখকরা 'সন্দেশ'-এ লেখা বন্ধ করলেন। যে-দু'জন নতুন লেখক ছোট-পাঠকদের মাতিয়ে দিলেন, তাঁদের নাম রেবন্ত গোস্বামী আর শিশিরকুমার মজুমদার। দু'জনেই লিখলেন উপন্যাস—'অরু-মিতুদের কথা' আর 'ব্রান্টালুসি দুর্ঘটনা'। রেবন্ত খুব সংবেদনশীল গল্প লিখলেন। ওদিকে শিশিরকুমার লিখলেন রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। সবচেয়ে বড় কথা, এই দু'জন লেখক তাঁদের সারা জীবনটা 'সন্দেশ'-কেই দিয়ে দিলেন। অন্য কোনও পত্রিকায় তাঁরা লেখেননি বললেই চলে। একটি মাত্র পত্রিকাকে সারা জীবনটা দান করে দেওয়ার ঘটনা সত্যিই বিরল। এখানে ভুলে গেলে চলবে না, 'সন্দেশ' কোনও লেখককে তেমন টাকা দিতে পারত না। তা সত্ত্বেও 'সন্দেশ'-কে ছেড়ে কখনও কোথাও যাওয়ার কথা ওঁরা ভাবেননি। তাই 'পেশাদার' লেখকদের অভাব 'সন্দেশ' কখনও টের পায়নি। এটা 'সন্দেশ'-এর সম্পাদকদের একটা বড় কৃতিত্ব।

১৯৬৯-এর শেষের দিকে 'সন্দেশ' আবার অর্থসংকটের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রতি মাসে পত্রিকা বার করা আবার কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই একবার ভাবা হল, 'সন্দেশ' যদি বার্ষিক বেরয়, তা হলে কেমন হয়? বছরে একটা মোটা বাঁধানো সংখ্যা! কিন্তু টানা বারো মাস 'সন্দেশ'-এর বিরহ সহ্য করা উৎসাহী পাঠকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুগ্ম সম্পাদক লীলা মজুমদারও ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না এই সিদ্ধান্ত। তিনি অনুভব করতেন, 'সন্দেশ' না-থাকাটা প্রায় তাঁর মৃত্যুর সমান। তাই শেষ



তারিণী খুড়োকে নিয়ে লেখা একটি গল্পের সত্যজিৎ রায় কৃত খসড়া

পর্যন্ত ঠিক হল, 'সন্দেশ' হয়ে যাবে দ্বিমাসিক। প্রতি ঋতুতে একটা সংখ্যা বেরবে—গ্রীষ্ম সংখ্যা, বর্ষা সংখ্যা ইত্যাদি।

বড় 'সন্দেশ'

সম্পাদকরা জানতেন, দু'মাস পরে পত্রিকা হাতে পেলে খুদে পাঠকরা আরও অতিরিক্ত কিছু চাইবে 'সন্দেশ'-এর কাছে। মানে, দু'মাস 'সন্দেশ' হাতে না-পাওয়ার অভাবটা মেটাতে হবে। তাই ১৯৭০ থেকে বড় করে দেওয়া হল 'সন্দেশ'-এর মাপ। একালে সান্ধ্য খবরের কাগজের মাপ যেরকম হয়—'৭০ থেকে 'সন্দেশ'-এর মাপ দাঁড়াল সেইরকম (যাকে বলে 'ট্যাবলয়েড' মাপ)। সম্পাদকরা আশা করলেন, এই বড় 'সন্দেশ' গ্রাহক-পাঠকদের মন ভরিয়ে দেবে। আর দ্বিমাসিক হলে অন্য একটা বড় সুবিধে ছিল সত্যজিৎ রায়ের দিক থেকে। সুবিধেটা হল, গল্প-কবিতার ছবি আঁকার জন্য একমাস বেশি সময় পাওয়া যাবে। হলও তা-ই। টানা তিন বছর বেরিয়েছিল এই বড় 'সন্দেশ' ('৭০, '৭১, '৭২)। এই সময় 'সন্দেশ'-এর সব ছবিই নিজে এঁকেছিলেন সত্যজিৎ। পত্রিকার পৃষ্ঠা বড় ছিল বলে তাঁর আঁকা ছবির আয়তনও বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর তুলির টানও আরও জোরালো, আরও মোটা, আরও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল।

এই বড় পত্রিকায় 'সন্দেশ'-এর নিজস্ব লেখকরা আরও দাপিয়ে লিখতে লাগলেন। রেবন্ত গোস্বামী আর শিশিরকুমার মজুমদারের সঙ্গে যোগ দিলেন অজেয় রায়। ১৯৭০-এর শারদীয়ায় তিনি লিখলেন অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'মুঙ্গু'। পাখিদের হারিয়ে-যাওয়া 'মিসিং লিঙ্ক' নিয়ে আফ্রিকার পটভূমিতে লেখা হয়েছিল এই উপন্যাস। পাঠকরা পড়ে আপ্লুত।

এছাড়া ফেলুদা আর শঙ্কু তো বেরতেই লাগল বড় 'সন্দেশ'-এ। প্রথম বড় সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার 'শেয়াল-দেবতা রহস্য'। ১৯৭১-এর গ্রীষ্ম সংখ্যায় প্রোফেসর শঙ্কুর মান-মাতানো হাড়-কাঁপানো অ্যাডভেঞ্চার 'মরু-রহস্য'। দ্বিমাসিক হয়েও 'সন্দেশ' আগের মতোই মন-কাড়া রয়ে গেল।

তবে সবচেয়ে বেশি করে বলা দরকার একটা আশ্চর্য সিরিজ-এর কথা। তার নাম 'ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প'। (এই সিরিজ অবশ্য '৬৯ সালেই শুরু হয়েছিল।) তিন থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাদের উপযুক্ত খুদে-খুদে গল্প বাংলা-সাহিত্যে এর আগে কেউ লেখেননি। কেউ ভাবেনওনি। সেই অসাধ্য কাজটাই করে ফেললেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী—কবি সুকুমার রায়ের বোন, সত্যজিতের আপন পিসি। তিনি ছোট্টদের জন্য আধ পাতার গল্প লিখতে শুরু করলেন। যেমন তার মিষ্টি ভাষা, তেমনই গল্পের সরলতা। লিও তলস্তয় ছাড়া এরকম গল্প কেউ আগে লেখেননি। গল্পগুলো কেমন, সেটা বোঝানোর জন্য একটা পুরো গল্প উদ্ধৃত করছি—

আদুরে খুকু

খুকু অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে আছে। মা কেন ওকে ফেলে দাদুর বাড়ি চলে গেলেন? বললেন, 'দাদুর অসুখ। তুমি সোনা মেয়ে হয়ে পিসিমনির কাছে থেকো, আমি বিকালেই ফিরে আসব।'

না, খুকু সোনামেয়ে হবে না। পিসিমনির কাছে থাকবে না। কোথায় চলে যাবে, কেউ খুঁজে পাবে না। মা কাঁদবেন বেশ।

মা ফিরে এসে দেখলেন খুকু নাই। কত ডাকলেন, খুকুর সাড়া নাই! পিসিমা বললেন 'এই তো ছিল, কোথায় গেল? সারাদিন মেয়ের কী কান্না, কত বায়না, কিছুতেই ভোলানো যায় না!'

মা দেখলেন দরজার পরদাটা নড়ছে—তার তলা দিয়ে ছোট্ট দু'টি পা বেরিয়ে আছে। বললেন, 'খুকুর জন্য ওর দিদা আমসত্ত্ব দিয়েছেন, মাসি চকোলেট দিয়েছে—'

এবার পরদাটা একটু ফাঁক করে একটা চোখ দেখা গেল।

'তা, খুকু তো বাড়ি নেই, ওগুলো আমরাই খেয়ে ফেলি?'

হুস করে পরদা সরে গেল—ঝুপ করে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকু বলল 'কই মা চকোলেট? আমসত্ত্ব কোথায়?'

তবে বড় 'সন্দেশ'-এর তিন বছরে গ্রাহক-পাঠকরা একটা অভিযোগ বারবার করছিল। সেটা হল—আরাম করে চিৎ হয়ে শুয়ে বড় 'সন্দেশ' পড়া যায় না। হয় উপুড় হয়ে, বা টেবিলে পেতে ঝুঁকে বসে পড়তে হয়। তা ছাড়া বড় 'সন্দেশ' বইয়ের আলমারির তাকে দাঁড় করিয়েও রাখা যায় না। এই সব অনুযোগ শুনে-শুনে 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের কান ঝালাপালা! শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—'সন্দেশ' আবার আগের মতোই ছোট করে দেওয়া হবে। 'সন্দেশ'-এর মাপ আগের মতোই হয়ে গেল ১৯৭৩-এর মে মাস থেকে।

আবার ছোট

'সন্দেশ' আবার ছোট হতেই দুই সম্পাদক তাঁদের কলমের জোর নিয়ে নেমে পড়লেন। ১৯৭৩-এর এপ্রিল-মে (বৈশাখ) সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে লাগল লীলা মজুমদারের ক্লাসিক উপন্যাস 'বাতাস-বাড়ি'। সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবি। লীলা মজুমদারের এই উপন্যাসের পাশাপাশি বেরতে লাগল 'সন্দেশ'-এর একান্ত নিজস্ব লেখক শিশিরকুমার মজুমদারের অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'তুফান-দরিয়ার পরাণ মাঝি'। সুন্দরবনে এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের পটভূমিতে লেখা এক দুঃসাহসী মাঝির দুর্দান্ত কাহিনি। বিশুদ্ধ বাঙালি পরিবেশে এমন অভিযানের কাহিনি এর আগে বা পরে লেখা হয়নি। গ্রাহক-পাঠকরা বুঝল, মাপে আবার ছোট হয়ে গেলেও 'সন্দেশ'-এর প্রাণশক্তি পুরোপুরি অটুট। সে-বছরই শারদীয়ায় বেরল সত্যজিতের ফেলুদা'র ছোট উপন্যাস 'সমাদ্দারের চাবি'। তাঁর ভাষার সম্মোহনী প্রাসাদগুণের কথা আর বলছি না—শুধু প্লটের দিক থেকেই 'সমাদ্দারের চাবি' ফেলুদার শ্রেষ্ঠ তিনটে কাহিনির মধ্যে পড়ে।

সুতরাং, নানা বাধা-বিপত্তি পার হয়েও 'সন্দেশ' নিজের সমস্ত গুণ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। এর প্রধান আটটি কারণ—



'বাদশাহী আংটি'-র অলংকরণ

১) সত্যজিৎ রায়ের নিয়মিত লেখা আর আঁকা।

২) লীলা মজুমদারের গল্প-উপন্যাস।

৩) 'সন্দেশ'-এর নিজস্ব তিনজন লেখক—শিশিরকুমার মজুমদার, রেবন্ত গোস্বামী ও অজেয় রায়ের নিয়মিত লেখা।

৪) এমন একটা গ্রাহক-পাঠক গোষ্ঠী, যারা 'সন্দেশ'-এর প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে 'কমিটেড'।

৫) 'সন্দেশ' আপিসে (যেটাকে বলা হত 'সন্দেশ কার্যালয়') নলিনী দাশের অসাধারণ বাণিজ্য-পরিচালনা, যাকে এখন বলে 'ম্যানেজমেন্ট'।

৬) 'সন্দেশ'-কে ঘিরে একদল স্বেচ্ছাসেবী, যাঁরা অবসর সময়ে 'সন্দেশ'-এর কাজ নিয়মিত করে দিতেন।

৭) 'সন্দেশ'-কে ঘিরে গড়ে-ওঠা চার-পাঁচজন শিল্পী, যাঁরা সত্যজিতের ব্যস্ততার সময় 'সন্দেশ'-এ নিয়মিত ছবি এঁকে দিতেন।

৮) সত্যজিতের আঁকা 'সন্দেশ'-এর বাৎসরিক প্রচ্ছদ।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে 'সন্দেশ'-এর জগতে নতুন একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। সেটা হল, কয়েকজন শিল্পী সম্পাদকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সত্যজিৎ প্রথমে বাছাই করলেন এই নিবন্ধের লেখককে! মনে আছে, কোন গল্প কিংবা কবিতার সঙ্গে আমার আঁকা ছবি মানাবে—সেটা অধিকাংশ সময়েই ঠিক করে দিতেন সত্যজিৎ রায়। কী করে বুঝলাম? দেখতাম, ছবি আঁকার জন্য আমার হাতে যে-লেখাগুলো আসত, অনেক সময়ই সেগুলোর ওপর লেখা থাকত—'উজ্জ্বল ছবি আঁকবে'। এই লেখাটা থাকত নানা রঙের কালিতে। কখনও বেগুনি, কখনও বাদামি, কখনও কালো। ওই হাতের লেখাটা যে সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ের—সেটা আর বলে দিতে হত না। আজ স্বীকার করছি, পাণ্ডুলিপির ওপর ওই লেখাটা দেখলেই ছবি আঁকার উৎসাহ তিন গুণ বেড়ে যেত। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় আমাকে ছবি আঁকতে ডেকেছেন, সত্তরের দশকে একটি ১৭ বছরের ছেলের মনে এটা একটা আলাদা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। এই অনুভূতির তুলনা ছিল না। মনে হত, উচ্চ মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করলেও এতটা রোমাঞ্চিত হতাম না! ('সন্দেশ'-এর অন্য লেখক-শিল্পীদেরও এরকমই অনুভূতি হত বলে শুনেছি!)

আমি আঁকতে শুরু করার বছর দু'-এক পর 'সন্দেশ'-এ ছবি আঁকতে শুরু করলেন সুবীর রায়। হাসির ছবি আঁকায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তারপর, জোরালো তুলির টান নিয়ে 'সন্দেশ'-এর পাতায় নেমে পড়লেন শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য। তিনি স্বশিক্ষিত শিল্পী। কাব্যিক তুলির টানের সঙ্গে তাঁর ছবিতে জড়ানো থাকে আশ্চর্য এক ভালবাসা আর মায়া। এরপর একে-একে এলেন দেবাশিস দেব, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু চাকী, পার্থ দাশ, সমীর দাস...। দেবাশিস দেব আর কৃষ্ণেন্দু এখন বিখ্যাত পেশাদার শিল্পী। তাই ওঁদের আঁকা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা সবাই ওঁদের জানি।

সত্যজিৎ যে-বছর চলে গেলেন, সেই ১৯৯২ পর্যন্ত 'সন্দেশ' এভাবেই চলেছিল। এর মধ্যে, সত্তরের মাঝামাঝি, 'সন্দেশ'-এর তৃতীয় সম্পাদক হিসেবে 'অফিসিয়ালি' যোগ দিয়েছিলেন নলিনী দাশ। ১৯৬৩ থেকেই তিনি সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব কিছুটা সামলাতেন, কিন্তু ১৯৭৫ থেকে তাঁর নাম ছাপা হতে লাগল 'সন্দেশ'-এর মলাটে। 'সন্দেশ'-এর আপিসটাকে নলিনী দাশ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রায় একাই। 'সন্দেশ'-এর যাবতীয় 'অফিসিয়াল' কাজ তাঁর বাড়িতেই হত। ডাকে-আসা-পাণ্ডুলিপি ফাইল করা, পাণ্ডুলিপি লীলা মজুমদার আর সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে পাঠানো, মনোনীত লেখা প্রেসে পাঠানো, প্রুফ দেখা, বাঁধাই-হয়ে-আসা 'সন্দেশ' খামে ভরে-ভরে রাসবিহারী পোস্ট



অফিসে পাঠানো—সব কাজই হত সরাসরি তাঁরই পরিচালনায়। যত দিন তিনি বেঁচেছিলেন, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে 'সন্দেশ' স্টলে-স্টলে ঠিক পৌঁছে যেত। কোনও দিন এই নিয়মের অন্যথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান না-হয়েও, 'সন্দেশ' যে প্রতি মাসে এটা করতে পেরেছে, তার প্রধানতম কৃতিত্ব নলিনী দাশের। তাঁর স্বামী অশোকানন্দ ছিলেন 'সন্দেশ'-এর 'কমিটেড' কর্মী। নিজে সূর্য সেন স্ট্রিটের কাগজের আড়তে ঘুরে-ঘুরে 'সন্দেশ' ছাপার জন্য কাগজ বাছাই করতেন। এমনকী, যেসব আপিসে বিজ্ঞাপনের টাকা পাওনা আছে, সেখানে নিজেই যেতেন পেমেন্ট-এর জন্য তাগাদা দিতে। ছোটদের একটি পত্রিকার 'ম্যানেজমেন্ট' কীভাবে পরিচালনা করতে হয়—সেটা অশোকানন্দ ও নলিনী দাশের জুটিকে নিয়ে গবেষণা করে শিখতে পারেন একালের ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা।

'সন্দেশ' যে-কয়েকজন শিক্ষিত, প্রতিভাবান, অনুগত স্বেচ্ছাসেবী পেয়ে গিয়েছিল, তার নেপথ্যের ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ আজ বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। পুরনো সম্পাদকদের কেউই এখন আর নেই। নির্দ্বিধায় এখন সত্যি কথাটা বলা যায়। আসলে প্রথম দিকের দুই সম্পাদক লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ'-এর 'কমিটেড' লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁরা বাড়িতে গেলে সব কাজ বন্ধ রেখে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতেন। কিছু দিন দেখা না-হলে নিয়মিত তাঁদের চিঠিপত্র লিখতেন। 'সন্দেশ'-এর 'কমিটেড' লেখক অজেয় রায়ের বাড়িতে সত্যজিৎ ও লীলা মজুমদারের লেখা এরকম বহু চিঠি পাওয়া গিয়েছে। দুই সম্পাদকের মধ্যে সত্যজিৎ রায় আবার তরুণ শিল্পী ও লেখকদের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করতেন। কীভাবে? শিল্পীদের ছবিতে উনি মাঝে-মাঝেই নিজের তুলির টান ছুঁইয়ে ছবিগুলো সংশোধন করে দিতেন। আর বড়-বড় চিঠি লিখে তরুণ লেখকদের শেখাতেন কীভাবে প্লট গড়ে তুলতে হয়, কীভাবে চরিত্রয়াণ করতে হয় ইত্যাদি। আর কোনও বাঙালি সম্পাদক এই কাজটা কোনও দিন করেছেন বলে শোনা যায়নি। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, সত্যজিৎ রায়ের মতো বিরাট ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী আকর্ষণেই বাধা পড়েছিলেন 'সন্দেশ'-এর কমিটেড লেখক, শিল্পী ও কর্মীরা। এই টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

'সন্দেশ'-এর গত ২০ বছর

সত্যজিৎ চলে যাওয়ার পর, কয়েক বছর 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছিলেন লীলা মজুমদার ও বিজয়া রায়। কিন্তু ক্রমেই ওঁরা অশক্ত হয়ে পড়লেন। তাই 'সন্দেশ'-এর দায়িত্ব এসে পড়ল সন্দীপ রায়ের কাঁধে। এই সময় 'সন্দেশ' 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন'-এর আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিল। এই টাকা ফুরনোর আগেই সন্দীপ রায় ডেকে নিলেন নতুন এক যুগ্ম সম্পাদককে। তিনি সুজয় সোম। তিনি ছিলেন সত্যজিতের আমলের 'কমিটেড' কর্মীদের মধ্যে একজন। তাই 'সন্দেশ'-এর নাড়ি তিনি খুবই ভাল বুঝতেন। সন্দীপ ও সুজয় সোমের যৌথ সম্পাদনায় 'সন্দেশ' খুবই উঁচু মান স্পর্শ করেছিল ২০০৫-'০৬ সালে। 'সন্দেশ'-এর অনেকগুলো পাতা রঙিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সময় 'সন্দেশ'-এর খরচ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, কয়েক লক্ষ টাকার ঘাটতি নিজের পারিবারিক উপার্জন থেকে মিটিয়েছিলেন সন্দীপ রায়। সেই ব্যয়ভার বেশি দিন বহন করা 'সন্দেশ'-এর পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল না। তাই পুরনো পরিচালন-সমিতি আবার ফিরে এসে 'সন্দেশ'-এর দায়িত্ব নিল।

এই ১০০ বছর বয়সেও 'সন্দেশ' আজও বেঁচে আছে। 'সন্দেশ'-এর 'কমিটেড' লেখকদের মধ্যে অজেয় রায় ও শিশিরকুমার মজুমদার আর নেই। রেবন্ত গোস্বামী বয়সের ভারে আর উপন্যাস লেখার ধকল নিতে পারেন না।

তবুও বলব, 'সন্দেশ' আজও বেঁচে আছে সেই 'কমিটেড' কর্মীদের দৌলতেই। সন্দীপ রায়ের সঙ্গে এখন 'সন্দেশ'-এর যুগ্ম সম্পাদক প্রণব মুখোপাধ্যায়। অবসরপ্রাপ্ত এই ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন সত্তরের দশকে গড়ে-ওঠা 'সন্দেশ'-এর 'কমিটেড' কর্মীদের মধ্যে একজন। 'সন্দেশ'-এর তিন সম্পাদকেরই প্রিয় পাত্র। বিশেষত, সত্যজিৎ রায় বিশেষ স্নেহ করতেন প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। তাই 'সন্দেশ'-এর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি ইনি খুবই ভাল শুনতে পান। এই মাসে 'সন্দেশ'-এর যে-সংখ্যাটা বেরিয়েছে, তারও উঁচু-মান অটুট।

সত্যজিৎ রায় না-থাকার ফলটা 'সন্দেশ'-এর পক্ষে কেমন, নিজের অনুভূতি দিয়ে সেটা আমি ভালই বুঝতে পারি। ১৯৭৩ থেকে '৯২ পর্যন্ত আমি প্রচুর ছবি আঁকতাম 'সন্দেশ'-এ। স্বীকার করছি, এখন আর 'সন্দেশ'-এ আঁকতে ইচ্ছে করে না। অন্য কোনও ছবি আঁকতেও ভাল লাগে না। মনে হয়—ছবি এঁকে যদি নিজের হাতে সত্যজিৎ রায়কে দেখাতে না-পারি, তা হলে আর এঁকে লাভটা কী?

মানছি, এটা মাত্রাতিরিক্ত সত্যজিৎ-প্রেম। কিন্তু এটাই বাস্তব।

এই নিবন্ধের সব অলংকরণ সত্যজিৎ রায়ের

কৃতজ্ঞতা : সন্দীপ রায় ও সত্যজিৎ রায় সোসাইটি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

হলুদ বন সবুজ মন

'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম দুই বছরে মোট পনেরোটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'বনের খবর'-এ। প্রমদারঞ্জনকে কাজের জন্য বহু দেশ, বহু পাহাড়, বহু অরণ্য ঘুরতে হলেও 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত প্রথম পনেরোটি কিস্তির বেশির ভাগ খবর ছিল বার্মার শান স্টেট-এর, ত্রিপুরার লুসাই পাহাড়ের আর অসমের কাছাড় অঞ্চলের বন-পাহাড়ের।

'সখা', 'মুকুল', 'সখা ও সাথী', 'বালক' প্রভৃতি পত্রিকা ততদিনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনের মধ্যগগনে বিরাজমান হলেও নোবেল পুরস্কার পেতে তখনও কয়েক মাস বাকি। এমনই একসময় মুদ্রণ বিষয়ে আলোড়ন তোলা উপেন্দ্রকিশোর প্রকাশ করলেন ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র 'সন্দেশ'। উপেন্দ্রকিশোর শুধু মুদ্রণ-বিশারদই ছিলেন না, তাঁর লেখার হাতটিও অসাধারণ ছিল। বিশেষ করে 'ছেলেমেয়েদের জন্য' লেখায় তাঁর ছিল বিশেষ দক্ষতা। কিন্তু শুধুমাত্র ছেলেমেয়ে ভোলানো ছোট-বড় গল্প বা পুরাণের কথা লিখেই ক্ষান্ত হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। তাঁর বিশেষ পছন্দের বিষয় ছিল কোনও জায়গা ঘুরে এসে তার সম্বন্ধে লিখে কচিকাঁচা পাঠকদের উৎসাহিত করা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'সখা' এবং 'মুকুল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত পুরী এবং দার্জিলিং ভ্রমণ বিষয়ক একাধিক রচনা থেকে।

এহেন মানসিকতার উপেন্দ্রকিশোর যে তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় এই ধরনের কিছু প্রকাশ করতে চাইবেন, তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ফলে 'সন্দেশ' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩২০) থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর'।

'ধাঁধা' বা 'কথাবার্তা'-র মতো নিয়মিত বিভাগ না ধরলে 'বনের খবর'-কে বলা যেতে পারে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত প্রথম ধারাবাহিক রচনা। অবশ্য এর আগে 'জাপানী দেবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৩২০-র আষাঢ় এবং শ্রাবণ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দু'টি কিস্তির আয়তন দেখে বোঝা যায় যে, উপেন্দ্রকিশোরের নিজের লেখা এই রচনাটি দুই কিস্তিতে ভাগ করতে হয়েছিল শুধুমাত্র আষাঢ় সংখ্যায় স্থানাভাবে।

উপেন্দ্রকিশোরের এগারো বছরের ছোট ভাই প্রমদারঞ্জন রায় (১৮৭৪-১৯৪৯) শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হলেও ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র চাকরিতে যোগ দেন। ইঞ্জিনিয়র হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, কিন্তু যে পরীক্ষা দিয়ে জরিপ বিভাগের চাকরিটি তিনি লাভ করেন, তাতে প্রথম হয়েছিলেন প্রমদারঞ্জন। এখানে বলে রাখা যায়, প্রমদারঞ্জনের জন্মের চার দশক আগে জরিপ বিভাগেরই এক শাখায় যোগ দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন আর এক বঙ্গসন্তান রাধানাথ শিকদার। আর ১৮৭৯-তে লামার ছদ্মবেশে তিব্বত ঘুরে এসেছিলেন আর এক বাঙালি জরিপ কর্মী এবং অভিযাত্রী বাবু শরৎচন্দ্র দাস।

জরিপের কাজে যেমন ছিল রোমাঞ্চ, তেমনই ছিল প্রতি পদে বিপদের আহ্বান। আর ছিল প্রকৃতির নৈকট্য। সভ্যতা থেকে বহু দূরে, মানুষের পায়ের চিহ্ন না-পড়া, শ্বাপদসংকুল গহন অরণ্যে, দুর্গম পাহাড়ে, জানা-অজানা নদী বা জলস্রোতের উপত্যকায় বা অববাহিকায়, মরুপ্রান্তরে তাঁবু খাটিয়ে দিনের পর দিন থাকতে হত তাঁদের। সঙ্গী বলতে হাতে-গোনা কয়েকজন সহকর্মী আর কুলি-মজুর।

কাজের তাগিদে ব্রহ্মদেশ বা আধুনিক মায়ানমার, শ্যামদেশ, অর্থাৎ বর্তমানের তাইল্যান্ড, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেলুচিস্তানের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চল চষে ফেলতে হয়েছিল প্রমদারঞ্জনকে। তিনি জরিপের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৯৯ সাল নাগাদ। তার চোদ্দো বছর পর অগ্রজ উপেন্দ্রকিশোরের অনুরোধে কলম ধরলেন। 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হতে শুরু করল 'বনের খবর'। অবশ্য কলম প্রমদারঞ্জন ধরেছিলেন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই। কখনও ডাকবাংলো, কখনও তাঁবুতে বাস করার সময় যত্ন করে লিখতেন তাঁর রোজনামচা। জঙ্গলে-পাহাড়ে চোখে দেখা এবং কানে শোনা প্রতিটি ঘটনা লেখা থাকত সেখানে। শুধু দিনলিপি লেখাই নয়, প্রতিটি রোমহর্ষক বা মজার ঘটনা তিনি মনেও রেখে দিতেন। প্রমদারঞ্জনের কন্যা, বিখ্যাত লীলা মজুমদার তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'পাকদণ্ডী'-তে লিখেছেন, সন্ধেবেলা স্কুলের পড়া তৈরি হয়ে গেলে তাঁরা, ভাইবোনেরা মিলে বালিশে ঠেস দিয়ে বসা বাবার কোলে-পিঠে-পেটের ওপর চেপে বসে 'জরিপ-বিভাগে কাজ করতে গিয়ে ঘোর বেঘো জঙ্গলে বাবার নানান লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার' সত্যি গল্প শুনতেন। তাঁর মতে, 'এমন চমৎকার সরস গল্প বাংলায় খুব বেশি নেই।' 'বনের খবর' লেখা হয়ে পরে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হলে লীলা মজুমদারের মনে হয়েছিল, '(গল্পগুলো) ছোটবেলায় বাবার কাছে যেমন শুনেছিলাম, হুবহু তাই। শুধু তার গায়ে সাহিত্যের সোনার আলো লেগে গেছে।'

সম্পাদক তথা অগ্রজ উপেন্দ্রকিশোর যতই শিশু-সাহিত্যিক হন, তিনি প্রকৃতির বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দার্জিলিং বিষয়ক রচনা 'মেঘের মুলুক'-এ (সন্দেশ, আষাঢ় ১৩২১) তিনি পথের ধারের অরণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন :

'পথের ধারে বিশাল বড় বড় সব গাছ, তাতে নানা রঙের ফুলও আছে। কোনও কোনওটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে, কোনও কোনওটার গায় লম্বা লম্বা দাড়ির মতো শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে তাকাই—উঃ! কী ঘন বন! পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে।' হয়তো ইনি হেন লেখক-সম্পাদক-অগ্রজ-ই প্রমদারঞ্জনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন 'সন্দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকা ছেলেমেয়েদের জন্য কলম ধরে 'বনের খবর' লিখতে।

জঙ্গলের মধ্যে যেসব জায়গা থেকে নিকটবর্তী লোকালয় সাড়ে তিনশো-চারশো মাইল দূরে, ভিনদেশি শহুরে মানুষদের বুনো কুকুর, বাঘ, হাতি, ভালুক প্রভৃতির সঙ্গে মোলাকাতের ঘটনা পরিবেশন করা হত 'বনের খবর'-এ। আর থাকত বার্মা, তাইল্যান্ড, অসম, প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের



'বনের খবর'-এ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অলংকরণ

জীবনযাত্রার গল্প। হিংস্র বাঘ বা জংলি হাতির মুখোমুখি হওয়া ছিল তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়। জঙ্গলের ভিতর গ্রামের উপজাতীয় মানুষরা যেভাবে বাঘ বা হাতির মোকাবিলা করত, তার খবরও দেওয়া হত। ব্রহ্মদেশের শান স্টেট-এ জঙ্গলের মধ্যে আঠারো-উনিশদিন হেঁটে এক বৌদ্ধ মঠে পৌঁছে সেখানকার পুরোহিতের পোষা মাছ চুরি করে বহুদিন ভাল খাবার না-পাওয়া লেখকের দলের কয়েকজন লোক। কিন্তু পরেরদিন তারা জঙ্গলে পথ হারিয়ে এমন ঝামেলায় পড়ে যে, সে মাছ আর তাদের খাওয়া হয়নি। আবার জন্মগতভাবে মাকুন্দ শান সম্প্রদায়ের একটি ছেলের গোঁফ গজানোর শখ হওয়ায়, তাকে গোঁফ গজিয়ে দেবে বলে ঠকাতে চেষ্টা করে লেখকের এক সঙ্গী। এই ধরনের মজাদার খবরও লেখক লিখতে ভোলেননি।

'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম দুই বছরে মোট পনেরোটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'বনের খবর'-এ। প্রমদারঞ্জনকে কাজের জন্য বহু দেশ, বহু পাহাড়, বহু অরণ্য ঘুরতে হলেও 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত প্রথম পনেরোটি কিস্তির বেশির ভাগ খবর ছিল বার্মার শান স্টেট-এর, ত্রিপুরার লুসাই পাহাড়ের আর অসমের কাছাড় অঞ্চলের বন-পাহাড়ের। একটি মাত্র কিস্তিতে (মাঘ, ১৩২০) লেখা হয়েছিল পাঠানদের দেশ বালুচিস্তানের কথা। তবে সে গল্পকে আবার ঠিক বনের খবরও বলা যায় না। প্রথমত, ও-দেশ এমনই রুক্ষ আর পাথুরে যে, সেই উষর ভূমিতে গাছপালা প্রায় জন্মায় না। আর দ্বিতীয় কারণ হল, ওই খবর কোনও বন্যপ্রাণীর নয়, বালুচিস্তানের দুর্ধর্ষ ডাকাতদের।

দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২১-এর পর কোনও কারণে 'বনের খবর' আর প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমারের মৃত্যুর পর ১৯২০-র দশকে 'সন্দেশ' যখন সুবিনয় রায়চৌধুরী এবং সুধাবিন্দু বিশ্বাসের সম্পাদনায় নব পর্যায়ে প্রকাশিত হয়, তার দ্বিতীয় বর্ষে 'বনের খবর'-এর আরও কয়েকটি কিস্তি প্রকাশিত হয়। প্রমদারঞ্জনের মৃত্যুর পর সিগনেট প্রেস 'বনের খবর' নামক বইটি প্রকাশ করে, সেটি কিন্তু শুধুমাত্র 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত লেখাগুলোর সংকলন নয়। সেই বই হয়েছিল প্রমদারঞ্জনের ডাইরির নোট থেকে অবসরজীবনে তাঁরই লিখে রাখা খাতার ভিত্তিতে। (সূত্র : পাকদণ্ডী। লীলা মজুমদার)

'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে 'বনের খবর' প্রকাশিত হওয়ার সময় অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা ভাবতেন এ বুঝি লেখকের কল্পনাপ্রসূত কোনও গল্প। শেষ পর্যন্ত আষাঢ় ১৩২১ সংখ্যার পত্রিকায় সম্পাদকীয় টীকা দিয়ে জানাতে হয়, লেখক বনে-জঙ্গলে ঘুরে কাজ করার সময় নিজেই এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ-লেখা ঘরে বসে কল্পনা করে লেখা গল্প নয়। অবশ্য পাঠকদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বাংলা ভাষায় এ ধরনের আরণ্যক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বিবরণ ছোটদের জন্য তো বটেই, বড়দের জন্যও আগে লেখা হয়নি। 'বনের খবর' যখন 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হতে শুরু করে, প্রকৃতিকে সাহিত্যে উঠিয়ে নিয়ে আসা পথিকৃৎ বিভূতিভূষণ তখনও স্কুলের গণ্ডি পার করেননি। জিম করবেট তখন বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গাড়োয়াল-কুমায়ুনের বনে-পাহাড়ে। বন্দুক রেখে কলম তুলে নিতে তাঁর আরও বিশ বছর বাকি। সেই সময়ের পাঠকের কাছে এই ধরনের ফার্স্ট-হ্যান্ড বিবরণ ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। আর সেই কারণেই 'বনের খবর' হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের এক মাইলস্টোন, যাতে 'সন্দেশ'-এর অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যোমযাত্রীর ডায়ারী

'সন্দেশ'-এর ১৩৬৮ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রফেসর শঙ্কু-কে নিয়ে লেখা প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়ারী'-র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় সেই গল্পের প্রথম কিস্তিটি সত্যজিৎ রায়ের করা অলংকরণ-সহ পুনর্মুদ্রিত হল।

প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা আমি পাই তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে। একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি, এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো। গোল্ড মাইন।'

তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্পটল্প এনে দিয়েছেন। খুব যে ভাল তা নয়; তবে বাবাকে চিনতেন, আর ছেড়া জামাটামা দেখে মনে হত ভদ্রলোক বেশ গরিব; তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ-দশ টাকা করে দিয়েছি।

এবারে গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো হল নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোন অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ-সবের সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর যে ডায়রি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সে ডায়রি তারকবাবুর কাছে এল কী করে?

জিগ্যেস করাতে তারকবাবু একটু হেসে হাত বাড়িয়ে আমার মসলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোট এলাচ বেছে নিয়ে বললেন, 'সুন্দরবনের সে ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

এই রে, আবার বাঘের গল্প। তারকবাবু তাঁর সব ঘটনার মধ্যেই বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?'

'উল্কাপাত! ব্যাপার তো একটাই।'

ঠিক, ঠিক। মনে পড়েছে। এটা সত্যি ঘটনা বটে। কাগজে বেরিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল। বেশ বড় পাথর। কলকাতার জাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। মনে আছে, কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মড়ার খুলি বলে মনে হয়েছিল।

বললাম, 'তার সঙ্গে এই খাতাটার কী সম্পর্ক?'

তারকবাবু বললেন, 'বলছি। ব্যস্ত হোয়ো না। আমি গেস্‌লাম ওই মওকায় যদি কিছু বাঘছাল জোটে। ভালো দর পাওয়া যায়, জান তো? আর ভাবলুম অত জন্তুজানোয়ার মোলো, তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না? কিন্তু সে গুড়ে বালি। লেট হয়ে গেল। গিয়ে দেখি সব উধাও। যে যা পেয়েছে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। হরিণ-টরিণ কিচ্ছু নেই।'

'তা হলে?...'

'ছিল কিছু গোসাপের ছাল। তাই নিয়ে এলাম। আর এই খাতাটা।'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'খাতাটা কি ওইখানেই...?'

'গর্তের ঠিক মধ্যিখানে। পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জান তো? তোমাদের চারখানা হেদো তার মধ্যে ঢুকে যায়। এটা ছিল তার ঠিক মধ্যিখানে।'

'বলেন কী!'

'বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। লাল-লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললাম। তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করলাম।'

'উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা? তার মানে কি...?'

'পড়ে দেখো। সব জানতে পারবে। তোমরা তো বানিয়ে বানিয়ে গপ্পটপ্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার। এ আমি হাতছাড়া করতাম না, বুঝলে! নেহাত বড় টানাটানি যাচ্ছে তাই...'

টাকা বেশি ছিল না কাছে। তাছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে। দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তারপর পুজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তিকাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল।

খাতাটা হাতে নিয়ে খুলেই কেমন যেন খটকা লাগল।

যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং ছিল সবুজ। আর আজ দেখছি লাল। এ কেমন হল?

খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।

বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

এবার দেখি কালির রং নীল।

তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে!

এবারে তো আর কোন ভুল নেই; কালির রং সত্যিই বদলাচ্ছে!

হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দু'দিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, এই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হল না।

হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়। টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।

কী খেয়াল হল, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরলাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল বদলাল, কিন্তু আর কিচ্ছু হল না।

সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা আজ তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এসব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।



১ লা জানুয়ারি।
আজ থেকে ডায়রি লেখা আরম্ভ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।

রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিংওয়াক সেরে বাড়ি ফিরেছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হল। চমকে গিয়ে চিৎকারটা করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া। এ ক-বছরে আমারই চেহারা ওইরকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার ওপর ক্যানেস্তারাটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর দ্ধি হল না। আশ্চর্য!

চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuff gun বা নস্যাস্ত্রটা ওর উপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাগ করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়। এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনো থামেনি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘণ্টার আগে ও-হাঁচি থামবে না।

২রা জানুয়ারি।
রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, ক্রমশই সেটা দূর হচ্ছে। যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই মনে জোর পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি।

এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কারিটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী। ঘড়িটায় দম দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে তা আর জানব কী করে? এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হলেই এসব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। আর কাঁটা ঘোরানোর ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। রকেট যে খানিকটা উঠেই গোঁৎ খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

রকেট পড়ায় ভবতোষবাবুর মুলোর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচ শ টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন। একেই বলে দিনে ডাকাতি। এদিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোন আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই।

এইসব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোন অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার।

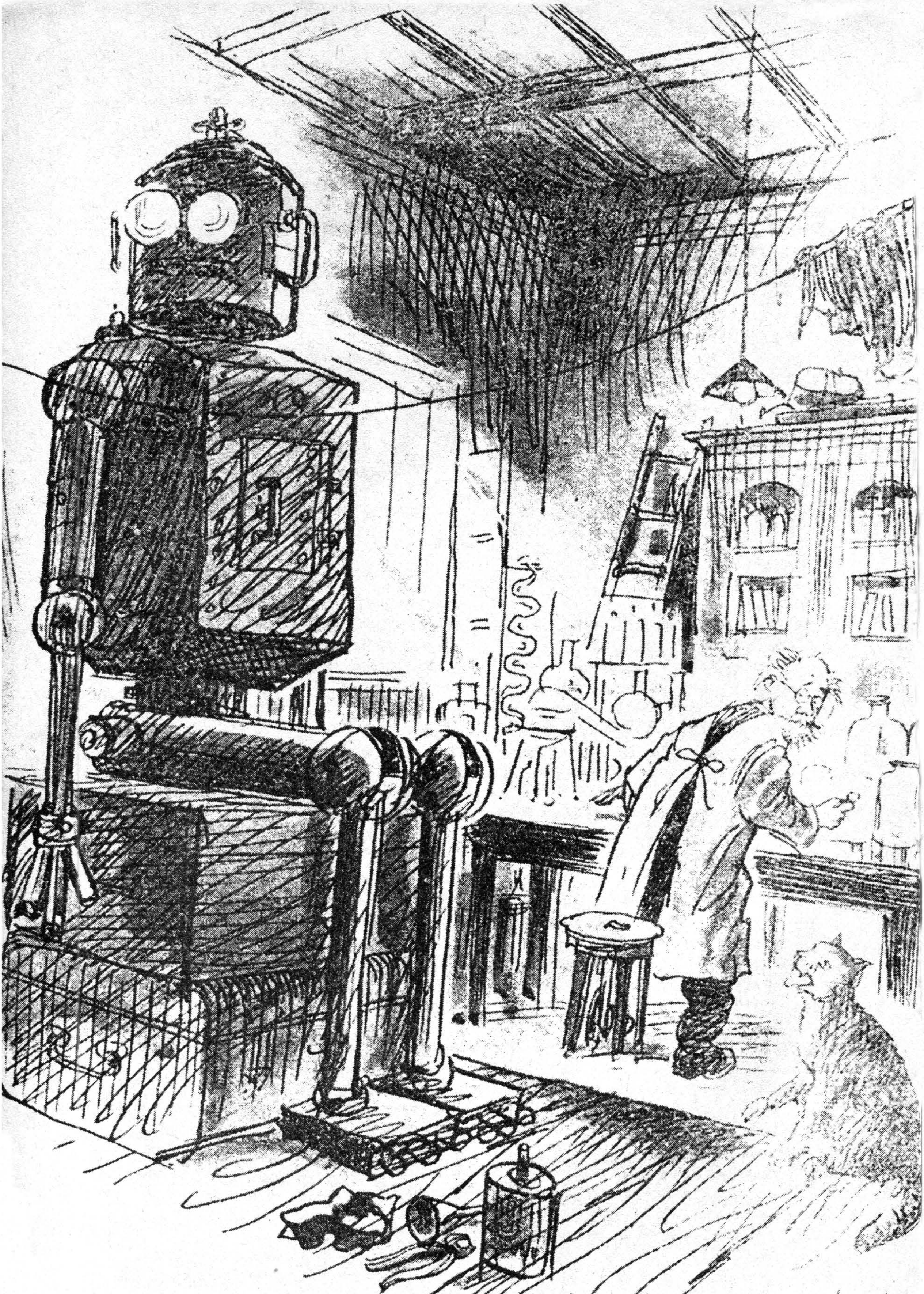
৫ই জানুয়ারি।
প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধা হবে। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযান কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন। অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয়, কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে।

প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেবার যখন কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকর্নিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উল্টে ফেলে দিল, তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না। স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইট পাউডারের স্তূপটার দিকে চলেছে, কিন্তু দুটোর কনট্যাক্ট হলে সে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ ঘরে ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে একগাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল। আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি হলেই আমি, আমার ল্যাবরেটরি, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ, টিকটিকি, এসব কিছুই থাকত না।

তাই ভাবছি হয়তো ওকে নেওয়াই ভালো। ওজনেও কুলিয়ে যাবে। প্রহ্লাদ হল দু-মন সাত সের, আমি এক মন এগারো সের, বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন, আর জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম মিলিয়ে মন পাঁচেক। আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয়ে নেওয়া চলতে পারে।

৬ই জানুয়ারি।
আমার রকেটের পোশাকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্চিংড়ে ঢুকেছিল, আজ সকালে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বার করছি, এমন



সময় ভবতোষবাবু এসে হাজির। বললেন, 'কী মশাই, আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কোথায় চললেন। আমার টাকাটার কী হল?'

এই হল ভবতোষবাবুর রসিকতার নমুনা। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো। রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন, 'আপনার ওই হাউইটা এই কালী-পুজোর দিনে ছাড়ুন না। ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে।'

এক-এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল, এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটাও বোধহয় ভবতোষবাবু বিশ্বাস করেন না।

যাই হোক, আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান না দিয়ে বরং উল্টে তাঁকে খুব খাতির-টাতির করে বসতে বললাম। তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে। আমি জানতাম যে ভবতোষবাবু চায়ে চিনির বদলে স্যাকারিন খান। আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেইরকমই দেখতে একটি বড়ি তাঁর চায়ে ফেলে দিলাম। এই বড়িই হল আমার নতুন অস্ত্র। মহাভারতের জৃম্ভণাস্ত্র থেকেই আইডিয়াটা এসেছিল, কিন্তু এটায় যে শুধু হাঁই উঠবে তা নয়। হাঁই-এর পর গভীর ঘুম হবে, এবং সেই ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে।

আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে আমার দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।

৮ই জানুয়ারি।

নিউটনকেও সঙ্গে নেব। কদিন ধরেই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণস্বরে ম্যাও ম্যাও করছে। বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাবার সময় হয়ে আসছে।

কাল ওকে Fish Pill টা খাওয়ালাম। মহাখুশী।

আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। ও বড়িটাই খেল। আর কোন চিন্তা নেই। এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে।

১০ই জানুয়ারি।

দুদিন থেকে দেখছি বিধুশেখর মাঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ শব্দ করছে। এটা খুবই আশ্চর্য, কারণ বিধুশেখরের তো শব্দ করার কথা নয়। কলকব্জার মানুষ, কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে; এক নড়াচড়ার যা ঠং ঠং শব্দ। ও তো আমারই হাতের তৈরি, তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা। আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি। একদিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে।—

আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি। জিনিসটা যে কোনো সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার পর, ব্যাঙের ছাপা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কমপাউণ্ড তৈরি করেছি, এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, না-হয় একুইয়স্ ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব।

প্রথমে ট্যানট্রামটাই দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময় ঘরে একটা প্রচণ্ড খটাং খটাং শব্দ আরম্ভ হল। চমকে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণ ভাবে এপাশ-ওপাশ হচ্ছে এবং তাতেই আওয়াজ হচ্ছে। খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যে-ভাবে নাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম। কী হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যানট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথানাড়া থেমে গেল।

কাছে গিয়ে দেখি কোন গোলমাল নেই। কলকব্জা তেলটেল সবই ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার খটাং খটাং।

এ তো ভারী বিপদ! বিধুশেখর কি সত্যিই বারণ করছে নাকি?

এবার ভেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম। নিতেই আবার সেই শব্দ। কিন্তু এবার মাথা নড়ছে পর নীচে— ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে।

শেষ পর্যন্ত ভেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হল।

পরে ট্যানট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। না করলেই ভালো ছিল। সেই চোখ-ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনদিনও ভুলব না।

১১ই জানুয়ারি।

আজ বিধুশেখরের কলকব্জা খুলে ওকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যেসব জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক-এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোন অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এরকম হয়।

আর-একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বাইরের কোন জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে। এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত। মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উল্টো কোন শক্তি যদি কল্পনা করা যায়, তা হলে এটার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছুদূর উপরে উঠতে পারি, তা হলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোনও গ্রহে-টহে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

এ টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয়। একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি। সেই দিনটার কথা আজও বেশ মনে আছে।

বারো বছর আগে। আশ্বিন মাস। আমি আমার বাগানে একটা আরামকেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু-মৃদু বাতাস উপভোগ করছি। আশ্বিন-কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘণ্টা এই ভাবে শুয়ে থাকি, কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি। এক ঘণ্টায় অন্তত আট-দশটা উল্কা রোজই দেখা যায়। আমার দেখতে ভারী ভালো লাগে।

সেদিন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্যরকম। সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, এবং মনে হল যেন আমার দিকেই আসছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আমার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য!

আমি উল্কাটাকে ভালো করে দেখব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু দুটো কারণে খটকা রয়ে গেল। এক হল ওই আকর্ষণ, যেটার বশে আমি তার পরদিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করি।

আর-এক হল ওই গোলঞ্চ গাছ। সেইদিন থেকেই গাছটাতে গোলঞ্চর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে। এরকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কিনা জানি না। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাঁপড়ি। দিনের বেলা কুচকুচে কালো, কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোলে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

(বানান অপরিবর্তিত)

রোববারের ক্রমশ দেবেশ রায়

দুই সমুদ্র পারাপারে চার দশক

সৌরাংশুর সামনে একটা মৃতদেহ। কাপড় দিয়ে ঢাকা। এদিকে-ওদিকে টিভি ক্যামেরা, পুলিশ। আর সর্বত্রই ভিড়। এই ভিড়ের তালেই, পায়ে হেঁটে, বাঁক নিয়ে, মাটির দিশায় তিনি অকুস্থলে এসে পৌঁছেছেন। আর সেই খবরের জেরে শুরু হয়ে গিয়েছে পরস্পরবিরোধী প্রবল হইচই। চ্যানেলে-চ্যানেলে যা প্রচারিত হচ্ছে, তা শুনে ও দেখে বোঝা মুশকিল কোনটা সত্যি!

দ্বিতীয় সমুদ্রে যাওয়া

তেরো

নীরার গলায় দু'টি আর্তি মিশে গেল। যেন সে আচমকা একটা বড় বিপদে পড়ে গেছে, ভয়ে চিৎকার করে বাবাকে ডাকছে, বা, যেন, তার বাবাই একটা অনির্দিষ্ট বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে, নীরা যেন তার গলার জোরেই বাবাকে বাঁচাতে চাইছে।

যেমন এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে কথাবার্তা শুনছিলেন; বলছিলেন, 'বাবা' ডাকটা শুনে তিনি তেমন করেই তাকিয়েছিলেন। তাঁর তাকানো দেখে বোঝা যায় না—তাঁকেই যে ডাকা হচ্ছে, এটা, ডাকটা তাঁর কানে পৌঁছতেই তিনি বুঝেছিলেন। মাত্র কয়েক হাতের মধ্যে একটা মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকা আছে। এই ঘরটার লাগোয়া জায়গাটায় কথাবার্তা হচ্ছিল, মানুষজন বসে কিংবা দাঁড়িয়ে, মৃতার স্বামী আচমকা অপমান ও শোকে গলা দিয়ে পশুর মতো আওয়াজ করছিলেন ও যে-ভিড় সৌরাংশুদের ঘিরে ছিল, তার বাইরের পরিধিতে আচমকা এমন ডাকাডাকি উঠেই থেমে যাচ্ছিল। সেই ঘরটার এদিকের বেড়াটা কোনাকুনি ঐ মৃতদেহটাকে আড়াল করে রেখেছে। ঐ আড়ালটার জন্যই এমন মনে হতে পারছে না যে মৃতদেহটা ঘিরেই এই ভিড়, সৌরাংশু ও অফিসার-সহ, আলাপ করছে। আবার, ঐ আড়ালটা সত্ত্বেও মৃতদেহটা যে এই ভিড়ের শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিধির মধ্যেই আছে—এটাও কেউ ভুলতে পারছে না।

সৌরাংশু, 'বাবা'—ডাকটিতে, নীরার গলা চিনতে পারেননি—এমনও হতে পারে। বছর দশ পরে নীরার গলা এত কাছ থেকে শুনছেন। এমন আর্তস্বর শুনছেন কত দিন পর তার কোনো হিসেবই সম্ভব না—সৌরাংশুর পরিবারে এমন জোরে ডাকাডাকি প্রায় ঘটেই না। নীরাকে দেখে সৌরাংশু বলে ওঠেন, 'সে কী? তুই জানলি কী করে আমি এখানে?'

নীরা-ই যে ডেকে উঠেছে, তাতে সৌরাংশু যেন-বা বিস্মিত হলেন কেন?

এখানে এসে পড়া সত্ত্বেও সৌরাংশু কি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তিনি এখানে কেন এসেছেন?

আসার আগে তিনি ঠিক বোঝেননি। কিন্তু এইমাত্র বুঝেছেন, একটি মৃত্যুর কারণ দিয়ে মৃতের বাড়িঘরের লোকজনের সঙ্গে পুলিশের মত-পার্থক্য ঘটেছে। সে-পার্থক্য তো আইন-আদালতের ব্যাপার—সৌরাংশু কী করবেন?

সৌরাংশু কি না বুঝে চলে এসেছেন? ইচ্ছে করলে, সৌরাংশু তেমন কিছু ভাবতে পারতেন। কিন্তু সেটা ঠিক ভাবা হত না। এটা তিনি বুঝেই এসেছেন যে পুলিশের সঙ্গে একটা গোলমাল বেঁধেছে। মৃতদেহটা যে আটকে আছে, এটা তিনি বোঝেননি। যদি বুঝতেন, তা হলে কি আসতেন না? মৃতদেহটা তাঁর এখানে আসা ঠিক কি বেঠিক সেটা সাব্যস্ত করছে?

সৌরাংশুর নিজের কাছে ততক্ষণে উল্টো চিন্তাটাও পরিষ্কার হচ্ছিল। মৃতদেহটা তা-ও তার উপস্থিতির যুক্তি হতে পারে। মেয়েটি যে খুন হয়েছে—এ নিয়ে আপাতত সবাই একমত—পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে। কিন্তু এখানকার লোকজন বলছেন—ধর্ষণ ও খুন বলে পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে। পুলিশ বলছে—ধর্ষণের প্রাথমিক প্রমাণ নেই, খুনের আছে। সৌরাংশু কী করতে পারেন।

কিন্তু পাসপোর্ট অনুযায়ী সৌরাংশুর এই দেশ ভারতে একজন রবীন্দ্রনাথকেই দরকার হয় কাপড়ে বাটিক-রং করতে ও একজন গান্ধীকেই দরকার হয় মাঠে পায়খানা করলে সেটাকে জৈব সারে পরিণত করতে। সৌরাংশু নানা বিদেশের 'গ্রিন কার্ড হোল্ডার' বা 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট', কিন্তু অন্য কোনো দেশের নাগরিক নন, নাগরিক একমাত্র ভারতের, সৌরাংশু নিজেই নিজের এই মর্যাদা রক্ষা

করেছেন অনেক আপাত-সুবিধে অগ্রাহ্য করে ও অনেক আপাত-অসুবিধে সত্ত্বেও রক্ষা করেছেন, সেই অসুবিধেগুলি ভিতরে-ভিতরে তাঁকে তাঁর ভারতীয়-পরিচয়ের ন্যায্যতা সম্পর্কে বরং থিতু করেছে, যেন ভারতীয় হিসেবে সেই অসুবিধেগুলি মেনে নিয়ে তিনি তাঁর ভারতীয়তা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁকে দাম দিয়ে ভারতীয়-পরিচয় রক্ষা করতে হয়েছে, সেই তাঁর ভারতীয়তার ভারতে, তাঁর দেশে, রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী ছাড়া আর কোনো নিরিখই কাজ করে না, যে কোনো একজন সাধারণ মানুষকেও মতে, সাহসে ও কাজে এমন ব্যবহার করতে হবে যেমনটি ওঁরা দু'জন করতে পারতেন। অথচ ঐ দুজন যেমন নিজের মতের বা প্রাক্তন কর্মের সম্পূর্ণ উল্টোটাও করতে পারতেন, তেমন স্বাধীনতা তো আর সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না। স্ববিরোধিতা ধারণ করার মতো স্বভাব কি সবাই আয়ত্ত করতে পারে? গান্ধীজি যদি দিল্লির গরমে ভাঙ্গি কলোনি-তে থাকতে পারেন ও কুষ্ঠরোগীর ঘা পরিষ্কার করে দিতে পারেন, আর রবীন্দ্রনাথ যদি পদ্মার মরুভূমিতুল্য গরম বালির চরে বা বীরভূমের কর্কটক্রান্তীয় তাপে বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে মশা-মাছি কীট-পতঙ্গের সঙ্গে থাকতে পারেন—তা হলে তুমি কদ্দুর পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত, ক'দিনের প্রবাসী আর কোথাকার ভারতীয় যে, তোমার উল্টোডাঙার ফ্ল্যাটে গিয়ে বানতলার মানুষজন যদি তাদের বিপদে তোমাকে ডাকে, তা হলে তুমি 'না' করতে পারো কোন যুক্তিতে, যদিও, এ নিয়ে কৌতুকের অতিরিক্ত সুযোগ তোমার আছে, তুমি এই মানুষজনদের নিয়ে ঠাট্টা করতে পারো, নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করতে পারো, এ-কথা জেনেই যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর আত্মকৌতুকের শক্তি ও সাহস তোমার চাইতে কয়েক কোটি গুণ বেশি হলেও তাঁরা এই মানুষজনের সংকটকে কৌতুকের বিষয় মনে করতেন না।

এই কৌতুকটুকুই পরিবর্তিত সময়ের লক্ষণ। কিন্তু এখনো সে-কৌতুক জনসাধারণ বা দেশের মানুষ বলতে যে-সমষ্টি বোঝায়, তার পরতে-পরতে ঢোকেনি। এই পরিস্থিতিতে সৌরাংশুর উপস্থিতির কোনো মূল্য সৌরাংশুর নিজের তৈরি হওয়া দূরের কথা, বরং ঐ মানুষজনদের একটা উদ্ভট ধারণা সেই ধারণার উদ্ভটতা নিয়ে সৌরাংশুর মগজে-মনে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ও ছিল না। কিন্তু তবু তাঁকে আসতেই হবে, শুধু এই উদ্ভটকে প্রশ্রয় দিতে যে এঁরা এই সংকটে সৌরাংশুকে মনে করেছেন। সৌরাংশুকে আসতেই হবে—কোনো কারণ না-থাকা সত্ত্বেও আসতেই হবে, তিনি যে শ্রেণিতে আছেন সেখানকার অপার কৌতুকের বিষয় হয়েও তাঁকে আসতেই হবে—'বোঝেননি যে কলকাতায় এটা রাজনীতির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে', 'সম্মত যৌন-সম্পর্ক সত্ত্বেও ধর্ষণ তো ধর্ষণই—এই কথা সৌরাংশু পুলিশ অফিসারকে ঠিক কী ভাষায় বোঝালেন,' 'সৌরাংশুর একটা জারগন আছে, পুলিশ অফিসারের একটা জারগন আছে আর ওখানকার লোকজনের একটা জায়গা আছে—এই তিন জারগন মিলে ব্যাপারটা শেষ অব্দি কী দাঁড়াল', 'আমি কী করে জানব—পুলিশ অফিসার যা বলছিলেন, তা সত্যি কি না, যে, ওটা নিয়মিত ওদের মিলবার জায়গাই ছিল', 'পুলিশ অফিসার দেখাতে চান না প্রমাণগুলো', 'সে-বিষয়ে আমি সাবধান ছিলাম', 'হ্যাঁ, সেটা তো নিশ্চয়ই, অটোর ড্রাইভারের পাশে বসে বানতলায় পৌঁছেই তো প্রমাণ করে দিয়েছ তুমি কত চালাক'—এই সম্ভাব্য ও সম্ভূত কৌতুকনাট্যের সত্যের ভিতর দাঁড়িয়ে সৌরাংশুকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বড় মেয়ের উত্তর শুনতে হয়, 'সারা দুনিয়া দেখছে তুমি বানতলায় এখানে কী করছ, এক তুমিই জানো না তুমি এখানে এসেছ।' আবার, 'চলো এখন—'





'কোথায়?'

'এখান থেকে বেরোও তো, তারপর দেখা যাবে কোথায়—'

'তুই কী করে জানলি আমি এখানে?'

'বাবা, শোনো, এক তুমি ছাড়া পৃথিবীর সবাই জানে এখন তুমি বানতলায় একটা মার্ডার কেসে পুলিশের সঙ্গে এখানকার লোকজনের গোলমাল মেটাচ্ছ—'

'সে কী? কী করে?'

'এতগুলো নিউজ চ্যানেল এটা টেলিকাস্ট করছে। এটা আজকের সবচেয়ে বড় নিউজ।'

'মানে, এই মৃত্যুটা তো! হওয়াই তো উচিত রে। কখন মৃত্যু হয়েছে সে-সব জানি না। কিন্তু মৃতেরও তো কিছু অধিকার থাকে। এখনো পর্যন্ত ওঁকে পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হয়নি। কেন? এখানকার লোকজনের সঙ্গে পুলিশের মতের তফাত ঘটছে বলে। সে থাকতেই পারে। সে যেভাবে মেটে, মেটানো হোক। কিন্তু সে-কারণে তো একজন মৃত মানুষকে এভাবে ফেলে রাখা যায় না। একটা সামাজিক দায় থাকবে না—যিনি মারা গেছেন তাঁর প্রতি?'

'যাঁরা মেটাতে পারবেন, তাঁরা এসে গেছেন, এখন তুমি আমার সঙ্গে চলো—'

'কারা মেটাতে পারবেন? কারা এসেছেন? তোর সঙ্গে কোথায় যাব?'

নীরা হেসে ফেলে। সে ছোটখাটো, মাথার খুলিটা বড়, চিবুকটা ছোট, চোখ দু'টো বড়। মুখটা এমন যে হাসিটাই যেন ওর স্বাভাবিক ভঙ্গি। তার বাবার এই প্রশ্ন শুনে সেই স্বাভাবিক হাসিটাতে অসহায়তা মিশল।

'তুমি যে আজ এখানে এসে এই সব মেটাবে এটা কি আগে ঠিক ছিল?'

'কী করে ঠিক থাকবে! আমি তো তখন একটা টিভি চ্যানেলকে ইন্টারভিয়ু দিচ্ছিলাম। কোন চ্যানেল মনে নেই। গোল্লা বলে একটি ছেলে ছিল। মনে পড়েছে—মিরন ছিল একজন। গোল্লা আমাকে উল্টোডাঙার বৌদির তেলেভাজা খাওয়াল। কে যে খাওয়াল, বোঝা মুশকিল। বৌদি নাকি আমার নাম শুনে পয়সা নেননি। বলেছেন, দেশের সুসন্তানের কাছ থেকে তেলেভাজা খাইয়ে পয়সা নিতে পারবেন না। দেশের সুসন্তান হয়ে দেশের কী যে করলাম, নিজে জানি না কিন্তু সবাই জানে। দশ বছরে একবার বিশ-বাইশ দিন সুসন্তান বলে দেশমাতৃকার পিন্ডি দি। তখনই এঁরা গেলেন, বললেন, অপেক্ষা করলেন। কেন গেলেন আমার কাছে, সেটা এঁরা বলতে পারবেন। ঐ সুসন্তান বলেই হয়তো। আমিও এখানে আসব বলে আসিনি তোর ওখানেই যাচ্ছিলাম। কে একটা অটো ডেকে আনলেন। তারপর দেখছি—এখানে এসেছি।'

নীরা হেসে ফেলে হাসি চাপা দিয়ে বলে, 'তা হলে আমাকে

জিগ্‌গেস করছ কেন আমি কোথায় নিয়ে যাব—'

নীরার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সৌরাংশু একবার তাঁকে ঘিরে থাকা ভিড়টার দিকে তাকাচ্ছিলেন। একজন কাউকে দেখে তিনি আবার দেখলেন, চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার দেখলেন, এবার তার ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে গেল—নজর করে দেখার বা ভাবার সবচেয়ে নিশ্চেষ্ট সহজ ভঙ্গি।

সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সৌরাংশু জিগ্‌গেস করলেন 'নীরা, ঐ ছেলেটি কি মলয়?'

'হ্যাঁ তো—'

'মলয় তো, ওর দাড়ি পেকেছে কেন?'

'দাড়ি পেকেছে বলে—'

'সব দাড়ি?'

'সে নিজের চোখে দেখবে। আমার বাড়িতে চলো। সবাই থাকবে। কার দাড়ি পাকল, কার চুল কাঁচা হল নিজেই দেখো।'

'ওদের সবার কি তোর বাড়ি বাড়িতে যাওয়ার কথা আজ?'

'ছিল না। তুমি সকাল থেকে যে-কাণ্ড বাঁধিয়েছ সবাই সব জায়গা থেকে ছুটে আসছে। এখন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সবাই।'

'দূ-র। আমাকে আবার উদ্ধার করার কী আছে! আমাকে কি এখানে কেউ আটকে রেখেছে। যেমন এসেছি, তেমনি চলে যাব। তোদের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। এত সবাই জানল কী করে?'

'আচ্ছা বাবা, তুমিই এখন সবাইকে উদ্ধার করো। চলো এখন। সঞ্জীবকে দেখছ না? ঐ তো—' নীরা আঙুল তুলে দেখায়, সঞ্জীবও সেই ভিড় থেকে হাত তোলে ও নাড়ায়। সঞ্জীব নীরার স্বামী, সৌরাংশুর জামাই।

'ওদের কি অফিস-কাছারি নেই না কি? সবাই এখানে এসে জুটল কী করে?'

'তুমি যা কাণ্ড বাঁধিয়েছ, সবার কাজকর্ম অফিস-কাছারি মাথায় উঠেছে। চলো তো এখন—ইমনকে দেখেছ ঐ যে হাত তুলেছে—'

নীরার মেয়ে, সৌরাংশুও হাত তোলে।

'আমি যেদিন এলাম, সেদিন তো দমদমে এতজনকে দেখিনি। তোর কথা যদি সত্যিও হয়, তোরা কি ঘুম থেকে উঠেই টিভি খুলিস না কি?'

'কেউ হয়তো দেখেছে, তখন ফোন করে দেয়। আমাকে তো সুরমা কাকি ফোন করে বললেন, আমি তো জানিই না দাদা এসেছেন। এসেই—। এ কী কাণ্ড!', নীরা বোঝে সৌরাংশু সুরমা কে বুঝতে পারছেন না, 'ওঁদের উত্তরপাড়ার একটি ছেলের সকালে না কি সেতারের প্রোগ্রাম ছিল। সেটা দেখতেই কাকিমা টিভি খুলেছিলেন, আর বন্ধ করেননি।'

'সুনু কি উত্তরপাড়াতেই থাকে, সুরমার কাছেই?' সৌরাংশু যে সুরমাকে চিনে নিতেই পেরেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁর ছাত্র, অমৃত, অমৃতের স্ত্রী সুরমা, অমৃত-সুরমার একটা ছেলে সুনু। ডাক্তার। অমৃত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে মারা গিয়েছিল। কোনো বিশেষ কারণ দরকার হয়নি অমৃত-র। একটু গোলমেলে ছিল—স্বভাবে। পা থেকে মাথা অব্দি সৎ, আসক্ত ও নিঃস্বার্থ।

সৌরাংশু-র যে-বইটি তার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে ও যে-বইটির সুবাদে কলেজ অফ ফ্রান্স তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের অধ্যাপনার পদ প্রস্তাব করেছে, 'ম্যানার অফ লিভিং অ্যান্ড ডায়িং'—তার একটি অংশে, লেখার শুরুতে, তিনি নাম না-করে অমৃত-র কথাই বলেছেন। বইটিতে নানাভাবে, ও সেই অংশটিতে বিশেষ করে। সৌরাংশু বলেছেন—মৃত্যুর কোনো আচরণবিধি নেই, এমনকী যারা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করে তারা জীবনের আচরণ হিসেবেই মৃত্যুর ব্যবহার করে। হতে পারে, জীবনের আচরণে তার কাছে যা অনতিক্রম্য ম্যানার অফ লিভিং, সমাজের বা প্রচলের রীতিপদ্ধতি, সৌরাংশু 'প্রোটোকল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 'প্রোটোকল অফ লিভিং', তার সঙ্গে মিলল না। জীবনের রীতিবিধির সঙ্গে সেই ব্যক্তির 'ম্যানার অফ লিভিং', জীবনের আচরণ না-মেলায় তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের আচরণ পালন করতে হয়েছে। সৌরাংশু এই ম্যানার ও প্রোটোকলকে, আচরণ ও রীতিবিধিকে, কোনো ব্যক্তির আয়ত্তসাধ্য বলে স্বীকার করেননি। সেখানেই তিনি এরিক এরিকসন ও গিলে দেল্যুজ থেকে সরে এসেছেন। সৌরাংশু বলতে চেয়েছেন ব্যক্তি তার আইডেনটিটি-তে জন্মায়। তার শরীরে ভিতরের রসায়ন-হর্মোন ইত্যাদি তার সেই আইডেনটিটি তৈরি করে দেয়। প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলির ভিতরে জন্মের সময়, হস্তরেখা ইত্যাদি সেই নিহিত পরিচয়ের লৌকিক পাঠোদ্ধার—ভারতীয়দের মধ্যে ও ইহুদিদের মধ্যে এই লৌকিক পাঠোদ্ধার প্রচলিত। এই বইটিতেই সৌরাংশু 'গীতা'-র একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শত্রুদের হত্যা করার এই নাটকীয় সন্দর্ভে বলা হয়েছে বেঁচে-থাকার আচরণের কথা। যুদ্ধ ও হত্যার এই সন্দর্ভ শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে 'ম্যানার অফ লিভিং', জীবনে আচরণের সন্দর্ভ—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে যোগসাধনের আচরণ। সৌরাংশু আর এক অংশে লিখেছিলেন, জেনে হোক, না-জেনে হোক, বিশ্বযুদ্ধগুলিতে বা স্থানীয় যুদ্ধগুলিতেও সামরিক বাহিনী জীবনের এই যোগসাধনের আচরণ পালন করেন এই অংশটিকেই চিন্তাবিদরা সবচেয়ে মৌলিক মনে করেছেন। সামরিকতাবাদ, অহিংসাবাদ—এই সব ছাড়িয়ে যুদ্ধকে একটা ভিন্ন ধরনের যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রেও বইটি তাদের মিলিটারি আকাডেমি-তে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ, সৌরাংশু তাঁর অনুভব থেকে আচরণের এই তত্ত্বে পৌঁছেছেন এইটুকুই বলতে জীবনের আচরণই মানুষের একমাত্র আচরণ। তাঁর এই তত্ত্বের যে-সব ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে, তাতে সৌরাংশুকে ক্রমেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে যুদ্ধের অনতিক্রম্যতার একজন তাত্ত্বিক হিসেবে। এর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের কথা গুছিয়ে তুলতেই তিনি এখন কাজ করছেন। একজন স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হাঙ্গারিয়ান তাত্ত্বিক আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন—জীবাণুর সংক্রমণ, ইনফেকশনের সঙ্গে মানুষের জীবনাচরণ নিয়ে কোনও কথা সৌরাংশু বলেননি। সৌরাংশু এটা মেনে নিয়ে সেই কথাই ভাবছেন।

অমৃতের স্ত্রী সুরমা নীরাকে তাঁর বানতলায় আসার খবর দিয়েছে জেনে সৌরাংশু ভেবে ফেলেন, এত দিনের পরিচয় ওদের সঙ্গে, উনি কিন্তু কোনো দিন দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি—অমৃত নিজেকে মারতে পারে। অমৃতকে বুঝতে চেয়ে তিনি এক তত্ত্বে পৌঁছুলেন?

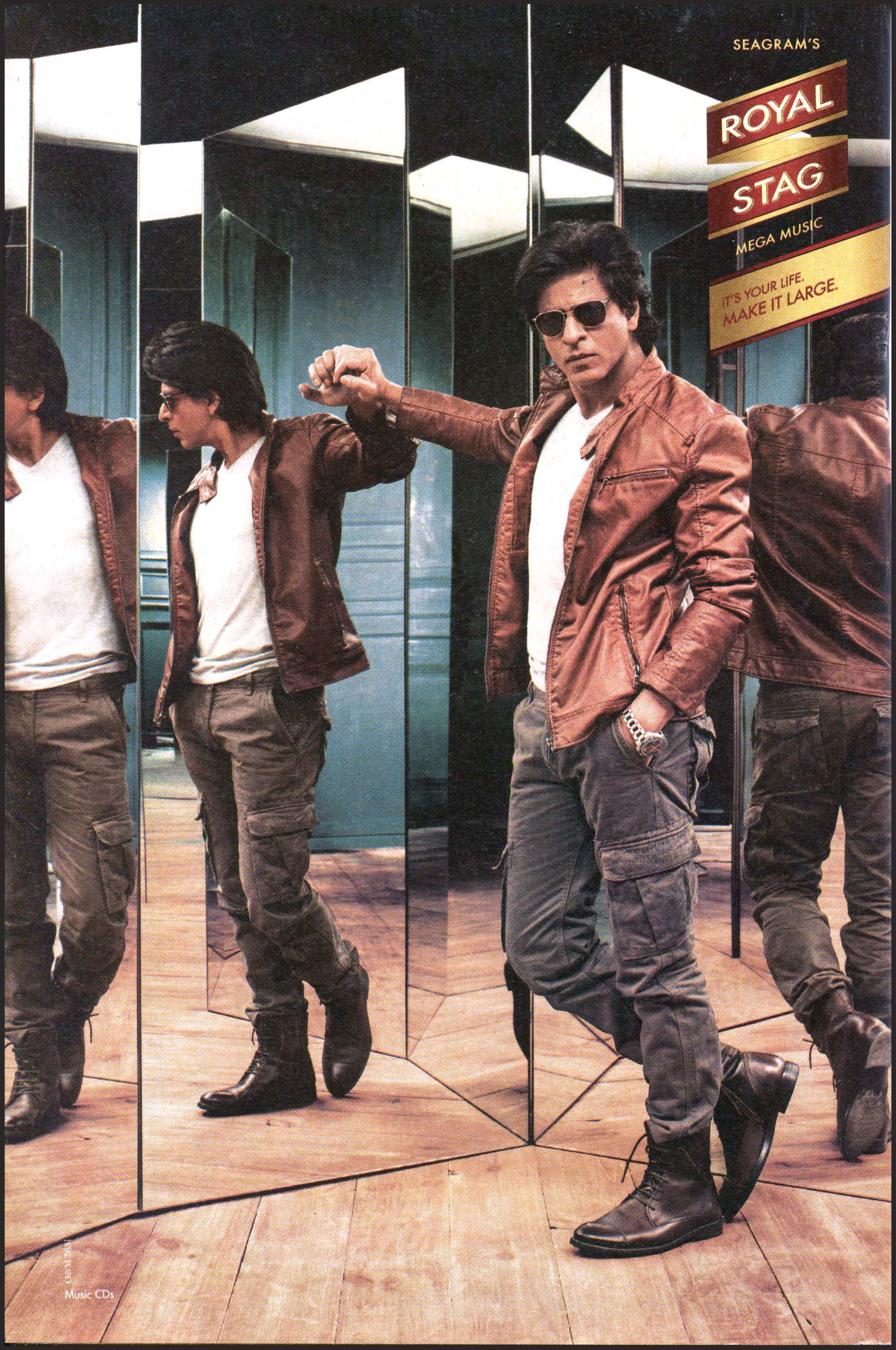
নীরা আঙুল না-তুলে দেখায়, 'ঐ যে দেখছ একজন ঘোরাফেরা করছেন, সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি পরে উনি একজন বড় মন্ত্রী। তোমার কাছে এসেছেন।'

'মন্ত্রী কেন আসবেন আমার কাছে? উনি নিশ্চয়ই নিজের কাজে এসেছেন, নইলে আসছেন না কেন?'

সৌরাংশুর বাড়ির লোকজন এসে গেছে দেখে, বিশেষত নীরা সৌরাংশুকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া জন্য এমন জেদাজেদি করছে দেখে মন্ত্রী ও পুলিশ অফিস এর ভিতর নাক গলাতে তো চানইনি, বরং একটু আড়াল নিয়ে চেষ্টা করছেন—সৌরাংশুকে নিয়ে নীরা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে। মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ ছিল, তা ছাড়া স্থানীয় থানার পুলিশও ছিল—তারা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না—সঞ্জীব-মলয়-ইমনকেও না।

(চলবে)

অলংকরণ : শান্তনু দে


SEAGRAM'S
ROYAL
STAG
MEGA MUSIC
IT'S YOUR LIFE.
MAKE IT LARGE.
Music CDs